নিরীক্ষা

জুলাই-সেপ্টম্বর ২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৫তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২২৫তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

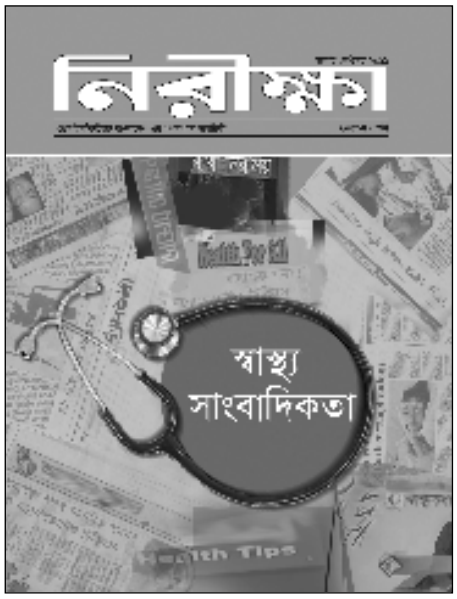

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭২ বছর পেরিয়েছে। প্রণীত হয়েছে স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি, ওষুধনীতি, মানসিক স্বাস্থ্যনীতিসহ ১৫টি নতুন আইন ও বিধি। স্বাস্থ্য খাতে কমিউনিটি ক্লিনিক, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্সসহ টেলিমেডিসিন সেবা গড়ে তোলা হয়েছে, যার সুবিধাভোগী এদেশের সাধারণ জনগণ। সীমাবদ্ধ সম্পদ, দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের এই অর্জন প্রশংসনীয়। এই অর্জনের স্বীকৃতি মিলেছে তিনটি জাতিসংঘ পুরস্কারসহ ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এটি করতে হলে বিভিন্ন নীতিমালার যথার্থতা নিরূপণ ও বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য সাংবাদিকরা নিতে পারেন অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা। এসব দিক বিবেচনায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার নানামুখী উদ্যোগ। বেড়েছে চ্যালেঞ্জ। নিত্যনতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, গবেষণা, আবিষ্কার স্বাস্থ্য সাংবাদিকতাকে দিয়েছে বহুমাত্রিকতা। বর্তমানে একজন স্বাস্থ্য বিটের সাংবাদিককে এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। এ চিন্তা থেকে পিআইবির গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষার এবারের সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে। এতে মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা, টেলিভিশনে স্বাস্থ্য-সংবাদ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন, গবেষণা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ ১৪টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। লেখাগুলো লিখেছেন স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রখ্যাত সাংবাদিক, গবেষক, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকগণ। সাংবাদিক, চিকিৎসক, পাঠক ও গবেষকদের লেখাগুলো কাজে আসবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অভিযাত্রা ৫
বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা
তৌফিক মারুফ

চিকিৎসা সংবাদ ৮
গণমাধ্যমের দায়িত্ব ও ভূমিকা
ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া

টেকসই উন্নয়নে স্বাস্থ্য ১০
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের ভূমিকা
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখা এবং স্বাস্থ্যপাতার ক্রমবিকাশ ১৬
ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম

মানসিক স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যম ১৮
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

টেলিভিশন স্বাস্থ্য-সংবাদ ২১
তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করে
জান্নাতুল বাকেয়া কেকা

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ২৪
সাংবাদিকতার সুযোগ
শিশির মোড়ল

২৮ **স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার খসড়া আলোচনা**
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
শিবলী নোমান

৩২ **বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ**
ইতিহাস, ধারণা ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ
মাহামুদুল হক

৩৫ **সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বাংলাদেশ**
নিখিল মানখিন

৩৮ **স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা, বিরল রোগ এবং নৈতিকতা**
বিনয় দত্ত

৪১ **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন**
সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্মতা বজায় রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ
মিনহাজ উদ্দীন

৪৪ **ই-বর্জ্য, স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যম**
শুভ কর্মকার

৪৮ **বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ**
ডা. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান খান

৬১ **গণমাধ্যম সংবাদ**

৬৬ **পিআইবি সংবাদ**

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২৫তম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সংবিধানে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় পরিবর্তন দৃশ্যমান। দুই দশক আগে স্বাস্থ্য নিয়ে যে পরিমাণ সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ পেত, এখন তার চেয়ে বেশি সংবাদ প্রচারিত হয়। শুধু পরিমাণে নয়, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার মানেও পরিবর্তন এসেছে

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৪

উন্নত, উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত– একটি দেশ যেমনই হোক না কেন, সব দেশের সরকারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি। বিশ্বজিত ঘোষ ও তার দলের ২০১৬ সালের একটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বর্তমান সময়ে জনস্বাস্থ্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক আর কোনো বিষয় নেই। উপরন্তু জনস্বাস্থ্য বিশ্বায়নকে যেভাবে প্রভাবিত করে বা করছে, অন্য কোনো বিষয় এভাবে বিশ্বায়নকে প্রভাবিত করতে পারেনি

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৮

স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগ, সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের অনেক প্রসিদ্ধ তত্ত্বের অনুযোগ ঘটেছে। যোগাযোগ বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব এবং কৌশল স্বাস্থ্য যোগাযোগ আওতাভুক্ত করেছে। এটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্যবার্তা প্রচারে মানবীয় ও মাধ্যম যোগাযোগের সমন্বয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে (Health Promotion) কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে পঠিত ও প্রয়োগকৃত

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩২

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

লেখা আহবান

বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলমগীর স্মরণে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগ্রহী সাংবাদিক, লেখক, সহকর্মী ও গুণগ্রাহীদের আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইলঃ pibnirikkha@gmail.com
dgpib@yahoo.com

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অভিযাত্রা

বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা

তৌফিক মারুফ

নোবেলজয়ী ড. অমর্ত্য সেন ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ স্বাস্থ্যবিষয়ক জার্নাল 'ল্যানসেট' এ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি নিয়ে লিখেছিলেন, "যারা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, তারা ভাবতেও পারেননি এই বাংলাদেশ একদিন ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সামনে এগিয়ে যাবে। যে দেশ কয়েক দশক আগে অতি দরিদ্র ছিল, তারা স্বাস্থ্য খাতসহ কয়েকটি সামাজিক সূচকে কীভাবে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করল, তা ভেবে দেখা খুবই দরকার।"

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। জন্ম গ্রহণের পর থেকেই এই অধিকার নিশ্চিত হয়ে থাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিক সেবার অন্যসব বিষয়ের সঙ্গে তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকেও যুক্ত রাখা হয় অপরিহার্যভাবেই। সে ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্যসেবাকে রাষ্ট্রের অন্যতম করণীয় চিহ্নিত করার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরুতেই নিয়েছিলেন দূরদর্শী নানামুখী পরিকল্পনা। যার প্রতিফলন ঘটে সংবিধানে স্বাস্থ্য অধিকারকে গুরুত্বের সঙ্গে সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়ে।

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সংবিধানে। কেন্দ্র থেকে মাঠপর্যায়ে তখনই অনেক ধরনের কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হয়। সেই সঙ্গে চিকিৎসায় জনবল তৈরির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মানসম্মত চিকিৎসাশিক্ষা এবং গবেষণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে স্থাপন করেছিলেন 'আইপিজিএমআর', যা বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়'। সেই সঙ্গে আগের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত জনবল ঘিরে আরও সংস্কার ও উন্নয়নে নজর দেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর অনেক উদ্যোগই শুরু করেন তখন থেকে। অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তাকেও উৎসাহিত করেন জনস্বার্থে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য। যার সুফল হিসেবে এখন দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছে।

তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের অন্যান্য খাতের মতোই অন্ধকারে ঢেকে যেতে শুরু করে স্বাস্থ্য খাতের যুগান্তকারী অনেক পদক্ষেপ। মাঝে ধীরগতিতে কিছু উন্নয়ন হলেও স্বাস্থ্য খাতে নতুন করে প্রাণশক্তি জাগরিত হয় ১৯৯৬ সাল থেকে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নেতৃত্ব আসার পর থেকে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর সময়কার অনেক পদক্ষেপকে নতুন করে এগিয়ে নেওয়ার কাজ, সেই সঙ্গে নিজের বিভিন্ন দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হয় স্বাস্থ্যের নতুন যাত্রা। যার ধারাবাহিকতায় বিশ্বের মডেল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওই মেয়াদেই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে। তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে প্রণীত হয় স্বাস্থ্যনীতি-২০০০। যদিও ২০০১ সালে ক্ষমতার পালাবদলে সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কমিউনিটি ক্লিনিক। স্থগিত হয়ে গিয়েছিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন। পরে ২০০৯ সালে আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার অনুসরণে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়কেও গড়ে তোলা হয় আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও কার্যকর হিসেবে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন কমিটিতে দলমত নির্বিশেষে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্ত করা হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা এবং রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা এবং রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের নিজ পকেট থেকে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় থেকে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সব নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করে জরুরি চিকিৎসাসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে দেশে এ সময়ে চিকিৎসাসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও ওষুধ শিল্পে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়। ওষুধ শিল্পে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে যায় গত কয়েক বছরে। এখন দেশে প্রায় ৮০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে শুধু এলোপ্যাথিক ওষুধ কোম্পানিই আছে ২০২টি। এসব কোম্পানির ৩ হাজার ৬৩৬ জেনেরিকের প্রায় ৩০ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়। দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধই উৎপাদন হয় দেশে। বিশ্বের ১৪৪ দেশে রফতানি হয় বাংলাদেশের ওষুধ।

এছাড়া শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, ২০২১ সালের প্রতিস্থাপন পর্যায়ে জন উর্বরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে সরকার। বিশেষ করে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা, চিকিৎসাশিক্ষাকে আধুনিকায়ন ইত্যাদি মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে সর্বশেষ স্বাস্থ্যনীতিতেও। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে চলছে বহুমুখী উদ্যোগ। একই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির ওপরও। বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের ধারার সঙ্গে তালমিলিয়ে বাংলাদেশের উপযোগী স্বাস্থ্যতথ্য ব্যবস্থা, ই-গভর্নেন্স, ই-হেলথ, ই-জন সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং টেলিমেডিসিন সেবা গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্ত হচ্ছে আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি। এর মধ্যে গত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে অর্জিত হয়েছে অনেক কিছু।

স্বাস্থ্য খাতে অর্জন

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইউএনডিপির ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু ৭২.৮ বছরে উন্নীত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয় মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু হ্রাস। গড় আয়ু খাতে বাংলাদেশ আশার অতিরিক্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে। সীমাবদ্ধ সম্পদ, দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের এই অর্জন অনুকরণীয়। মূলত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবায় সরকারি সুবিধার উৎকর্ষের কারণেই এই অর্জন। তিনটি জাতিসংঘ পুরস্কারসহ ১৬টি আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত। ১০ বছরে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বেড়েছে সাতগুণ। এখন পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৪.২ জন। গত ১০ বছরে ৭৪ ভাগ কমেছে। এক বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩১ জন। নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৯ জন। মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে প্রতি লাখে অর্জিত হয়েছে অগ্রগতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিও এবং ধনুষ্টংকারমুক্ত ঘোষণা করেছে। সারা দেশে ১৩ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে। 'কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন, ১০টি নতুন বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং চারটি নতুন জেনারেল হাসপাতাল চালু হয়েছে। নতুন হাসপাতালগুলোর কয়েকটি হলো– রাজধানীর চানখাঁরপুলে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল, উত্তরায় বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালকে সরকারি হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে, মুগদায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকার শ্যামলীর বক্ষব্যাধি হাসপাতাল (২৫০ শয্যা), কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, খুলনার আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল (২৫০ শয্যা), ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল (১০০ শয্যা), গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল (১০০ শয্যা) এবং এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে অনলাইন চক্ষুসেবা কার্যক্রম চালু করতে 'ভিশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল (৩০০ শয্যা)। এছাড়া ১০টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট চালু, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০৮টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। নতুন ১৮টি সরকারি এবং সামরিক বাহিনীর অধীনে ৬টি মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। পুরোনো মেডিকেল কলেজগুলোর জন্য ৭৫০টি আসন বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদানের কাজ শুরু হয়েছে। ইডিসিএলের নতুন নতুন কারখানা চালু হচ্ছে। প্রায় ২০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং নতুন নার্স নিয়োগ পেয়েছেন ১৫ হাজার। সরকারি হাসপাতালে নতুন ১০ হাজার ৯৮৩ শয্যা বাড়ানো হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন ওষুধনীতি। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১৪৪টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রফতানি হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩২ বিলিয়ন ডলারের ওষুধ রফতানি হয়েছে। ২০১৭ সালে ৩ হাজার ১৯৬ কোটি ১২ লাখ টাকার ওষুধ রফতানি হয়েছে। অনলাইনে মেডিকেল শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া চালু এবং

মেডিকেল শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে 'ওভারসাইট কমিটি' গঠন করা হয়। সারা দেশে ২২ জেলায় ৪২১টি মডেল ফার্মেসি চালু করা হয়েছে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। প্রথমবারের মতো উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের জন্য জিপ গাড়ি দেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি, মোট প্রজনন হার বা মহিলাপ্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ২.০৫-এ হ্রাস পেয়েছে। '১৬২৬৩' নম্বর ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান চালু হয়েছে। এই সেবার মাধ্যমে দেশের যে কোনো প্রান্তে অ্যাম্বুলেন্স সেবাও পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩২ লাখ সেবা গৃহীত হয়েছে। '১৬৭৬৭' নম্বর ব্যবহার করে 'সুখী পরিবার' সেবায় প্রদান করা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। কয়েক দফায় ১০ বছরে সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় ৫০০ অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। দেশের সব স্থানে গর্ভবতী মায়েদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজমকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাস্থ্যমান উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গৃহীত কর্মসূচিতে মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজমকে যেন পৃথক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা হোসেন ওয়াজেদ জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা গৃহীত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারপারসন সায়মা হোসেনকে দুবার বিশেষ সম্মানসূচক স্বীকৃতি দেয়। প্রথমে চ্যাম্পিয়ন অব দি অটিজম ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং পরে গুডউইল অ্যাম্বাসেডর অন অটিজম ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া ঘোষণা করে। এছাড়া স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি, পুষ্টিনীতি, ওষুধনীতি, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়। ১৫টি নতুন আইন, বিধি এবং অধ্যাদেশ হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯১.৩ শতাংশ শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১১টি টিকা দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের কালিহাতী, মধুপুর ও ঘাটাইলে অতি দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাপ্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 'শেখ হাসিনা হেলথ কার্ড' বিতরণ শুরু হয়েছে। ৫০টি রোগের চিকিৎসার খরচ এই কার্ডের মাধ্যমে বহন করা হবে। পর্যায়ক্রমে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ই-জিপি পদ্ধতি অনলাইনে যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ৯৫টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু, কম ওজনের শিশু জন্মহার ৩৬ শতাংশ থেকে কমে ২২.৬ শতাংশ হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আরও কিছু কাজ ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা মেডিকেল কলেজকে ৫ হাজার শয্যাবিশিষ্ট করে গড়ে তোলা, রাজধানীতে ৫০০ শয্যার অত্যাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ। জাতীয় কিডনি হাসপাতাল, নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। বিসিপিএস সেন্টার নির্মাণ। অ্যাজমা সেন্টার নির্মাণ, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ, জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালকে ৬০০ থেকে ১,৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসহ ২০টি মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নীতকরণ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর মেডিকেলে বার্ন ইউনিট নির্মাণ, ৩৬টি জেলা হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও উন্নীতকরণের প্রকল্প, ১২টি উপজেলায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, ৩৪টি উপজেলা হাসপাতালের সংস্কার, ১০, ২০, ৩১ বা ৫০ শয্যা হাসপাতালের (৬১টি) উন্নীতকরণ, ৯৭টি মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ চলছে। আরও ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮টি বিভাগীয় শহরে আরও ৮টি ক্যান্সার ও কিডনি হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও প্রতিবছরই টাকার অঙ্কে বাড়ছে স্বাস্থ্য বাজেটের পরিধি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য (স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ) চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এর বাইরে অন্য ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক বরাদ্দের হিসাবে ওই অঙ্ক দাঁড়ায় ২৯ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা।

একনজরে সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় মোট স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা কেন্দ্র ২ হাজার ২৫৮টি (কমিউনিটি ক্লিনিক বাদে)
* রেজিস্টার্ড প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক ৩১ হাজার ২৬২টি
* রেজিস্টার্ড প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ৯ হাজার ৫২৯টি
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৫ হাজার ৮০৭টি
* প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকে শয্যা সংখ্যা ৯০ হাজার ৫৮৭টি
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় চিকিৎসা জনবল ৭৪ হাজার ৯৮৫ জন
* বিএমডিসির নিবন্ধিত চিকিৎসক ২০ হাজার ৯১৪ জন (আরও প্রায় ৩ হাজার নিয়োগ হয়েছে)
* এমবিবিএস চিকিৎসক ৯৩ হাজার ৩৫৮, ডেন্টাল চিকিৎসক ৯ হাজার ৫৬৯ জন
* মোট মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ৫ হাজার ১৮৪ জন
* উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ৩ হাজার ৮০১ জন
* কমিউনিটি ক্লিনিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত সিএইচসিপি ১৩ হাজার ৫০৭ জন
* স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১ হাজার ৪৭ জন, উপস্বাস্থ্য পরিদর্শক ৩ হাজার ৬৩৬ জন, স্বাস্থ্য সহকারী ১৫ হাজার ৪২০ জন
* প্রতি ১ হাজার ৫৮১ জন নাগরিকের জন্য একজন চিকিৎসক
* প্রতি ১০ হাজার নাগরিকের জন্য সরকারি হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ৩.২৪টি, প্রাইভেট হাসপাতালে ৫.৫৭টি

লেখক: ডেপুটি চিফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

চিকিৎসা সংবাদ

গণমাধ্যমের দায়িত্ব ও ভূমিকা

ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া

স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতির খবরাখবর সাধারণ মানুষ এমনকি চিকিৎসকও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো থেকে পেয়ে থাকেন। সংবাদ প্রতিবেদনের বিষয় হিসেবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক ইস্যু অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন– রাজনীতি, ব্যবসা, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি থেকে আলাদা, যথেষ্ট সংবেদনশীল ও গতিশীল বিধায় স্বাস্থ্য-সংবাদ পরিবেশনে সংবাদকর্মীকে যত্নশীল থাকা প্রয়োজন। লক্ষ রাখতে হবে– কোনো সংবাদ যেন মিথ্যা প্রত্যাশা অথবা অতি জরুরি কোনো চিকিৎসা নিতে ভীতি সৃষ্টি না করে। ২০০৪ সালে তিনটি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, মাতৃগর্ভ থেকে নবজাতকে এইচআইভি ভাইরাস ছড়ানোর প্রতিষেধক নেভিরাপিন নামক ওষুধের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। অনেক চিকিৎসক এই খবরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন যে, এতে নবজাতকের এইচআইভি আক্রান্তের হার বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো প্রচার করে এর হার কমানোর পেছনে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে পোলিও, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিং কাশি ইত্যাদি নির্মূলে ইপিআই টিকা কর্মসূচির বৈপ্লবিক সাফল্যে সংবাদমাধ্যমের খবর এবং প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একইভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব, নিরাপদ পানীয় জল এবং খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, খাবার স্যালাইনের মাধ্যমে কলেরা-ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় গণমাধ্যম বিশেষ অবদান রেখেছে।

দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের কাছে জনগণ সঠিক, পক্ষপাতহীন এবং সম্পূর্ণ সংবাদ প্রত্যাশা করে। অস্ট্রেলিয়ান প্রেস কাউন্সিলের এক উপদেশে সংবাদমাধ্যমের নৈতিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে– 'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংবাদ পরিবেশনায় যথেষ্ট রক্ষণশীল ও সতর্ক থাকতে হবে।' স্বাস্থ্য খাতে কতগুলো পক্ষ রয়েছে, যারা কোনো একটি খবরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই খবরগুলো কারও ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে এই খাতে বিনিয়োগকারী ওষুধ কোম্পানি, হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক, এই খাতের পেশাজীবী (চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট), সরকার, বিমা কোম্পানি ও জনগণ। সংবাদকর্মীরা খবরের সূত্র খোঁজার পাশাপাশি অনুসন্ধান করবে যে সংবাদ সৃষ্টিতে এই পক্ষগুলোর স্বার্থ বা প্রভাব রয়েছে কি না। অনুসন্ধানমূলক স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সংবাদ সংগ্রহে সংবাদকর্মী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিপত্তি আর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

বাংলাদেশে যখন কয়েকটি সরকারি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট কিডনি প্রতিস্থাপনে সফলভাবে সুনামের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন কিডনি বিক্রির সঙ্গে জড়িত দালালচক্র ও ভুক্তভোগী দরিদ্র কিডনি

বিক্রেতাদের দুর্দশা নিয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করা হলো তাতে পরবর্তী সময়ে বৈধ কিডনিদাতা এবং সার্জনরা বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমন সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলো নিয়ে সংবাদ পরিবেশনায় আরও সাবধানি হতে হবে। যদিও কোনো কোনো সাংবাদিক সংবাদ পরিবেশনায় এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে এবং সমাজে এর প্রভাবের কথা বিবেচনায় না নিয়ে কেবল খবরটি পরিবেশনায় গুরুত্ব দিতে চান। স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ও পরিভাষাগত দিকটির কথা সবসময় মনে রাখতে হবে। খবরে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর ক্ষেত্রে সম্পাদক, সংবাদকর্মী ও লেখকদের বিশেষ নজর রাখা জরুরি। যেমন– স্টেম সেল (Stem Cell বিশেষ ধরনের কোষ, যা থেকে বহু ধরনের কোষ জন্মানো যেতে পারে) দিয়ে কিডনি রোগের চিকিৎসায় অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীর সাফল্য নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'গাছের কাণ্ড দিয়ে কিডনি রোগের চিকিৎসা!' আবার ডায়রিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত শিরায় দেওয়া স্যালাইনের নাম যদিও 'কলেরা স্যালাইন'; কিন্তু ভুল রিপোর্ট করা হয়েছে– 'ডায়রিয়ার রোগীকে কলেরা স্যালাইন দিলেন'। সময়ের আগে জন্ম নেওয়া প্রিম্যাচিউর নবজাতকের রক্তক্ষরণ রোধ করার জন্য ভিটামিন-কে ইনজেকশন খাওয়ানো হয়, এক নবজাতকের মৃত্যুর পর একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লেখা হয়– 'শরীরে ইনজেকশন না দিয়ে খাইয়ে দেওয়ায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ'। তাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে কারিগরি বা পেশাগত পরিভাষায় দখল থাকতে হবে।

আজকাল মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে টেলিভিশনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যে কোনো খবর টেলিভিশনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বিষয়টির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মাথায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদনের কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি সংবেদনশীল হওয়া উচিত, যেমন– আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনে। এই ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আত্মহত্যার কারণ ও পদ্ধতির কাহিনি প্রচার এবং কোনো ছবি, ভিডিও, লিঙ্ক প্রচার না করাই শ্রেয়। সংবাদটি এমনভাবে প্রচার করা উচিত যাতে এটিকে কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার মনে না হয়। অথবা কেউ যেন এটিকে কোনো সমস্যার সমাধান হিসেবে না ভাবেন। আত্মীয়-পরিজনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখা উচিত। এটিও একটি রোগ। আত্মহত্যা প্রতিরোধে সমাজকে সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি ভূমিকা রাখতে পারে, তা মাথায় রাখতে হবে।

নতুন ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতির খবর দিতে চাইলেও কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। দু-একটি গবেষণায় প্রমাণ হলে বা সাময়িকীতে প্রকাশ পেলেই তা ব্যাপক হারে জনগণের মাঝে প্রচার করা যাবে না। কারণ একটি নতুন ওষুধ যে কার্যকর ও নিরাপদ, তা প্রমাণের জন্য অনেকগুলো ধাপে গবেষণার পর সাধারণের জন্য সেটি প্রকাশ করা উচিত। যেমন– সম্প্রতি ডেঙ্গুজ্বরে পেঁপে পাতার রসের উপকারিতার ওপর সংবাদ প্রকাশের পর মানুষ ব্যাপক হারে নির্বিচারে তা খাওয়া শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো কেবল প্রাথমিক প্রতিবেদন। অধিকসংখ্যক রোগী এবং প্রাণীর ওপর এর কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব গবেষণার পরই এমন খবর প্রকাশ করা উচিত। এক্ষেত্রে সংবাদের সূত্রও খুব জরুরি।

আজকাল স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু। চিকিৎসা সঠিক না ভুল হয়েছে, তা একজন সংবাদকর্মীর তাৎক্ষণিক জানতে পারার কথা নয়। তবে এর ওপর তথ্যানুসন্ধান করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রকাশ করতে পারে। ক্যান্সারসহ কিছু বিশেষ রোগের খবর প্রকাশ এমনকি বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা উচিত যেন জনগণ সহজলভ্য বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা রেখে অপচিকিৎসার দিকে না ঝোঁকে। যেমন– বাংলাদেশের কোনো কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে বেশকিছু অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ আশা করা যেতেই পারে।

'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংবাদ পরিবেশনায় যথেষ্ট রক্ষণশীল ও সতর্ক থাকতে হবে।' স্বাস্থ্য খাতে কতগুলো পক্ষ রয়েছে, যারা কোনো একটি খবরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই খবরগুলো কারও ওপর প্রভাব ফেলতে পারে

চিকিৎসা গবেষণার ওপর রিপোর্ট করতে গেলে আরও কিছু বিষয় অনুধাবন করতে হয় যেমন– এই গবেষণার পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য। কতজন মানুষের ওপর তা করা হয়েছে। এর পেছনে ওষুধ কোম্পানির কোনো স্বার্থ রয়েছে কি না অথবা এই গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর সাধারণ মানুষের ভুল বোঝার অবকাশ থাকে কি না। যেমন– ২০০৫ সালে যুক্তরাজ্যের অরল্যান্ডোর ৪০ হাজার নারীর ওপর গবেষণা করে একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম সংবাদ পরিবেশন করে যে, রক্তে কোলেস্টেরল কমানোর স্ট্যাটিনজাতীয় ওষুধ গ্রহণে নারীর স্তন ক্যান্সার যারা স্ট্যাটিন গ্রহণ করেন না, তাদের তুলনায় অর্ধেক কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ নারী ওষুধ গ্রহণ করেছিল এবং ১.৪ শতাংশ স্তনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল। অর্থাৎ খুব সামান্যসংখ্যক ক্যান্সার রোগীর মাঝে স্ট্যাটিনের প্রভাব দেখা যায়, যা পরিসংখ্যানগত তেমন তাৎপর্য বহন করে না। আবার কোনো ক্যান্সার রোগী এই প্রতিবেদন পাঠ করে যদি ক্যান্সারের কেমোথেরাপি গ্রহণ না করে স্ট্যাটিন খেতে চায় তবে তার ক্ষেত্রে বিষয়টি যথেষ্ট বিপত্তির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

একই বছর জুলাইয়ে আমেরিকান হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্লাড ইনস্টিটিউট সে দেশের ন্যাশনাল কোলেস্টেরল এডুকেশন প্রজেক্টের গাইডলাইন প্রকাশ করে। এতে রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে স্ট্যাটিনের বিশেষ গুরুত্ব দেখানো হয়। কিন্তু প্রতিবেদন প্রকাশের মাত্র তিনদিন পর নিউজডেজ ব্রুকের কয়েকজন প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয় যে, সে প্রজেক্টের নয়জন চিকিৎসকের মধ্যে আটজন স্ট্যাটিন প্রস্তুতকারক কোম্পানি থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছিল। তাই নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনের একজন সম্পাদক জেরোমি কেজিরার ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলেন, 'ওরা যা-ই বলে, আমরা তা-ই বিশ্বাস করি কেন?'

সুতরাং নতুন উদ্ভাবিত ওষুধের ওপর সংবাদ প্রকাশিত হলে জনগণের ওপর কী প্রভাব পড়বে, তা ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো চিকিৎসক বা কোনো হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার সময় ভাবতে হবে তা সত্য কি না। ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি প্রতিবেদনটি ওই চিকিৎসক বা ওই হাসপাতালের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। সমাজে বা পরিবারে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ইমেজ নষ্ট হতে পারে।

উপরিউক্ত কারণে স্বাস্থ্য সাংবাদিককে নিম্নোক্ত কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে–

১. সংবাদসূত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। তা হতে পারে চিকিৎসক, হতে পারে হাসপাতালের কোনো কর্মী বা কর্মকর্তা অথবা কোনো ওষুধ প্রতিনিধি।
২. কোনো চিকিৎসক বা হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্য যাচাই করে তা প্রকাশ করা। এ কারণে একাধিক সূত্রের সঙ্গে ক্রস চেক করে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে।
৩. কোনো নতুন ওষুধ বাজারে এলে তা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপন না করে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কি না, তা যাচাই করে প্রতিবেদন লেখা।
৪. স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনো শব্দ বা পরিভাষা না বুঝে বা না জেনে প্রকাশ/উপস্থাপন না করা।
৫. চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো বীভৎস ছবি (সার্জারির সময়ের বা পোড়া মুখের ছবি বা আঘাপ্রাপ্ত/থেঁতলে যাওয়া কোনো ছবি) প্রকাশ না করা।
৬. মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা ধর্ষিতা বা এজাতীয় রোগীর সাক্ষাৎকার না নেওয়া।
৭. চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা হলে তা ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা।

আর এভাবেই সংবাদমাধ্যমগুলো চিকিৎসাপ্রার্থীদের একটি শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

টেকসই উন্নয়নে স্বাস্থ্য

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের ভূমিকা

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নচিত্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সড়ক যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গ্রাম-শহরের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্য কমিয়ে আনা, স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিত করাসহ প্রায় সবক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতিসংঘের নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রায় সবই বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীতে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বলা হচ্ছে– বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে ভিশন-২০৪১ সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছতে ডেলটা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও এগিয়ে চলছে। অপার সম্ভাবনার এই দেশে উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে হলে সম্ভাব্য সব সুযোগ-সুবিধা যেমন কাজে লাগাতে হবে, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধরে রাখা, নারী-পুরুষ সমতার বিধান করা, প্রযুক্তিগত ও সাইবার ক্রাইমের মতো ঝুঁকি মোকাবিলা করা, নিরাপদ খাদ্যের ঝুঁকি নিরসন করা, ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটানোসহ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মতো যেসব বাধা রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা।

এই প্রবন্ধে আমরা সব ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। তাই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সামনে রেখে উন্নয়ন লক্ষ্য-৩ (সব বয়সি মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ) বিষয়টি আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে দেখার চেষ্টা করেছি টেকসই লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জন করতে হলে যোগাযোগ কার্যক্রমের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন রয়েছে কি না। এই অভীষ্ট অর্জনে উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রম কীভাবে, কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ

সম্প্রতি কিছু গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো

চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে, এদেশে শিশুর অপুষ্টিজনিত রোগই অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, পানিবাহিত রোগ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ভেজাল খাদ্য, খাদ্যে ফরমালিনসহ ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার, শিশুর নিউমোনিয়া, এইচআইভি পজেটিভ, মাদকাসক্তি, অনিরাপদ যৌনাচরণ প্রভৃতি আমাদের জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি। নিরাময়যোগ্য রোগের বাইরেও অসংক্রামক বা দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন– হৃদরোগ, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টের মতো রোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য বড়ো হুমকি। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। মানুষের আবাসন সংকট, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপ্রতুল মাথাপিছু আয় ও দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো শহর-গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

অন্যদিকে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার অন্যতম। সমাজে নানা কারণে মানুষ সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা সমতাভিত্তিক মানবিক সমাজের কথা বলি; কিন্তু সমাজে লিঙ্গবৈষম্য রয়েই গেছে। রয়েছে জাতিগত বৈষম্য। নানা বর্ণের নানা ভাষার কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার লোকজনের মধ্যে একধরনের বৈষম্য বিরাজ করে। আবার মানুষ বয়স, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও অক্ষমতার কারণে যেমন সমাজে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে, তেমনই সম্পত্তি বা বসবাসের অবস্থানের কারণেও বৈষম্য তৈরি হয়। মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণেও অনেক সময় পরিবেশগত অবনতিসহ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ও জাতীয় বিপর্যয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ও নানা জাতীয় দ্বন্দ্বের কারণে স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। এতে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সমাজের এসব বৈষম্য সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা রয়েছে।

মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণেও অনেক সময় পরিবেশগত অবনতিসহ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ও জাতীয় বিপর্যয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ও নানা জাতীয় দ্বন্দ্বের কারণে স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। এতে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সমাজের এসব বৈষম্য সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা রয়েছে

সুপেয় পানির অভাব

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তার মধ্যে 'সবার জন্য পানি' অন্যতম। কারণ টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তার বিধান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ নিরাপদ পানি ছাড়াই পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, খামার বা কারখানায় বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ এমনকি শরণার্থীরাও সুপেয় পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েই গেছেন। তাদের সক্ষমতা নেই নিরাপদ পানির অধিকার বিষয়ে প্রতিবাদ করা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই গড়ে তোলার। এমন অসংখ্য মানুষকে নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে সমৃদ্ধিশালী ও বসবাসযোগ্য স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে তোলা কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে, পানির সঙ্গে জীব ও জীবনের সম্পর্ক। পানির সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বৃদ্ধি বা কমার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধার অভাব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফের যৌথ মনিটরিং প্লান (জেএমপি) প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৭তে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২.৪ মিলিয়ন মানুষ এখনো স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের শোভন টয়লেট সুবিধা নেই, ৮৫.৪০ মিলিয়ন মানুষের মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধার অভাব রয়েছে, ৩০.৮০ মিলিয়ন শহুরে মানুষ অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধার মধ্যে বসবাস করছে, ৪৭ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধায় চরম দুর্বলতা রয়েছে, প্রতিবছর শুধু ডায়রিয়ায় ২ হাজার ২২০ জন শিশুর মৃত্যু হয়, যাদের বয়স পাঁচ বছরের কম। দেশের ৪১ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা নেই। ফলে ৪০ শতাংশ কন্যাশিশু তাদের মাসিক চলাকালীন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। বিদ্যালয়পড়ুয়া কন্যাশিশুদের অধিকাংশই মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যেই বেড়ে উঠছে। বিশ্বে প্রতিদিন পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রায় ৭০০ শিশু শুধু ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে। এর কারণ হলো অনিরাপদ পানি এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা। বিশ্বের ৮০ ভাগ মানুষ অনিরাপদ ও অরক্ষিত পানির উৎস থেকে পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। কমপক্ষে ১৫৯ মিলিয়ন মানুষ খাবার পানি সংগ্রহ করে নদী, খালবিল, হাওড়, ডোবা-নালা বা পুকুরের মতো উৎস থেকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতায় প্রতিদিন বিশ্বে ৮০০-এর বেশি মায়ের মৃত্যু ঘটে, যার অন্যতম কারণ সুপেয় পানি ব্যবহারের সুযোগ না থাকা। দুঃখজনক হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত হওয়ার আগেই আশঙ্কা করা হচ্ছে– এই সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নতুন করে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানির তীব্র সংকটে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হতে পারে। নিরাপদ পানির সংকট মানে হলো মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাব্য ভয়াবহতা তৈরি হওয়া।

বাংলাদেশের অবস্থা

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৩ হাজার ১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৬০.৭৭ শতাংশ ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা নেই। ২৪.৩৩ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে বাইরে থেকে পানি এনে ড্রামে ধরে রাখতে হয়, শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে নারী-পুরুষের জন্য বা শিশুর জন্য আলাদা কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই। এসব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে নারীর স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকটা বেড়ে থাকে। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র বা রুরাল ডিসপেনসারি (আরডি)। পপুলেশন কাউন্সেলকৃত ২০১৫ সালের জরিপে দেখা যায়, ২৯ শতাংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই, নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা আছে মাত্র ২২ শতাংশ সেবাকেন্দ্রে, ৭৩.৬০ শতাংশ সেবাকেন্দ্রে হাত ধোয়ার উপকরণগুলো থাকে না এবং ৬৭ শতাংশ ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রের ওয়াশ ফ্যাসিলিটিজের দিকে নজর দিলে ভয়াবহ চিত্র নজরে আসে। মানুষ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যায় আরোগ্যলাভের জন্য, কেউই অসুস্থ হওয়ার জন্য হাসপাতালে যায় না।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ওয়াশ খাতে এক টাকা খরচ করলে তা ভবিষ্যতে ১৯ টাকা রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। সেখানে বাংলাদেশে শুধু ওয়াশ ও স্যানিটেশন খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে বছরে ২৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে থাকে। বিবিএস জরিপের ফল অনুযায়ী, এখনো আমাদের ৪৭.৭ শতাংশ হাউসহোল্ডে ব্যবহৃত পানি অনিরাপদ, ১২.৫ শতাংশ বাড়িতে আর্সেনিক দূষণ– এমন উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এ অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি-৬ অর্জন করতে হলে আমাদের বহুপথ যেমন অতিক্রম করতে হবে, তেমনি এসডিজি-৬ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল এমন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করতেও বেশ বেগ পেতে হবে। বিশেষ করে এসডিজি-৩ (সব বয়সি সব মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ) অর্জনে সফলতা ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না এসডিজি-৬ অর্জন করতে পারব। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগগুলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সরবরাহের মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোর জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে প্রায় ১৩ হাজার ১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণ করতে আসা মা ও শিশু এবং সেবাপ্রদানকারীর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে (সবার জন্য স্বাস্থ্য এসডিজি-৩, মানসম্মত শিক্ষা এসডিজি-৪ এবং সবার জন্য নিরাপদ পানি এসডিজি-৬) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে না।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ওয়াশ কার্যক্রম কতটুকু মানসম্মত, সে বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্য এখনো কারও কাছে নেই। কাজেই তুলনামূলক তথ্যভিত্তিক পরিস্থিতি সবার সামনে তুলে ধরা বেশ কঠিন। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১তে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম তেমন গুরুত্ব পায়নি। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৪তে অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা ও স্যানিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব, স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল পরামর্শ, জেলা-উপজেলা বা এর নিম্নপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সিভিল সার্জন অফিসের নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও দাতা সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, ওয়াশ ও স্বাস্থ্য সেক্টরের দক্ষতা, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এবং কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে সচেতনতা, আন্তঃসমন্বয় ও যোগসূত্রের ঘাটতিজনিত কারণেই আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ওয়াশ কার্যক্রম প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রায় দৃশ্যমান হতে পারেনি। এগুলো মোকাবিলা করা ছাড়া আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।

স্বাস্থ্যঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা করে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমঝোতা বা চুক্তিতে আসতে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। অ্যাডভোকেসি ব্যক্তিগত পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন, ধারণা বা জ্ঞান, মনোভাব, আচরণগত পরিবর্তন, ঝুঁকি অনুধাবন ক্ষমতা, আবেগ, সামাজিক প্রভাবসহ নানাবিধ বিষয়ে পরিবর্তন ঘটায়।

টেকসই উন্নয়নে যোগাযোগের ভূমিকা

যে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমে সবাইকে সম্পৃক্ত করতে, তথ্য দিয়ে, সচেতনতা তৈরি করতে তথ্য সম্প্রসারণ বা যোগাযোগ কার্যক্রম ব্যাপক ভূমিকা রেখে থাকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রক্রিয়ায়ও উন্নয়ন যোগাযোগ (অ্যাডভোকেসি, কমিউনিটি মবিলাইজেশন, আচরণ পরিবর্তন) কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা ছাড়া তো চিন্তাই করা যায় না।

টেকসই উন্নয়নে স্বাস্থ্য লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের ভূমিকা কতটুকু, তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন কার্যক্রমের জগতে অ্যাডভোকেসিকে যোগাযোগ কার্যক্রমের উপাদানসমূহের (অ্যাডভোকেসি, কমিউনিটি মবিলাইজেশন, আচরণ পরিবর্তন) মধ্যে অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অ্যাডভোকেসি মূলত নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। কৌশলগত দিক থেকে অ্যাডভোকেসি উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি, সংস্কার এবং বিদ্যমান নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে অবদান রেখে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন ও অ্যাডভোকেসি

প্রোথিত অ্যাডভোকেসি একটি অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে থাকে এবং এর প্রতিটি উন্নয়ন পদক্ষেপের কেন্দ্রে থাকে সেই মানুষ, যারা নিজেদের অধিকারের দাবি তুলে ধরতে এখনও যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণ, নাগরিক হিসেবে সবার সম-অধিকার নিশ্চিত করা, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতার বিষয়গুলো স্পষ্ট করা, মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশার মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করা, নাগরিক হিসেবে পরস্পরের দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতাগুলো সংশ্লিষ্টদের মাঝে তুলে ধরা, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং যথাযথ উন্নয়ন উদ্যোগগুলোকে উৎসাহিত করার কাজ করে থাকে। যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এই প্রোথিত অ্যাডভোকেসি সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে থাকে, নেতৃস্থানীয় দায়িত্বশীলদের উন্নয়ন পরিবেশ তৈরি করতে উৎসাহিত করে, যাতে ভুক্তভোগী মানুষ বঞ্চনার বন্ধ দরজা খুলে উন্নয়নের পথ দেখতে পান এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

আর প্রোথিত অ্যাডভোকেসি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা এমন মানুষের বিষয়ে কথা বলে, যার নিজের অধিকার ও দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার মতো সক্ষমতা নেই। প্রোথিত অ্যাডভোকেসি নাগরিক, আইনি ও নৈতিক উপাদানগুলো নিয়ে কাজ করে, যা প্রত্যেক নাগরিকের সম্মানজনক জীবনযাপনের পূর্বশর্ত। তাছাড়া নাগরিকের অধিকারের সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলে, যা মানবাধিকার, নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্রে অনুমোদিত এবং দেশের গঠনতন্ত্র, সংবিধান, প্রচলিত আইন, সামাজিক নিয়মনীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিভিন্ন সম্মেলন ও চুক্তির মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধ।

স্বাস্থ্যঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা করে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমঝোতা বা চুক্তিতে আসতে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। অ্যাডভোকেসি ব্যক্তিগত পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন, ধারণা বা জ্ঞান, মনোভাব, আচরণগত পরিবর্তন, ঝুঁকি অনুধাবন ক্ষমতা, আবেগ, সামাজিক প্রভাবসহ নানাবিধ বিষয়ে পরিবর্তন ঘটায়। একইভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটনের জন্য সমাজে নেতৃত্ব তৈরি, সবার অংশগ্রহণ, তথ্যের প্রবাহ ও তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, সম-অধিকারের ধারণা, মালিকানার ধারণা, সামাজিক সমন্বয়, সামাজিক নিয়ম এবং আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমরা আমাদের জীবনে যা কিছুই করি না কেন, তার প্রত্যেকটিই একেকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই করতে হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকির মতো বিষয় নিরসন করতে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে যোগাযোগ কার্যক্রম বা অ্যাডভোকেসি একটি প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়, এখানে একটি কাজের প্রত্যেকটি স্টেপ এবং সিদ্ধান্তগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলভাবে কাজটি শেষ করতে বলা হয়। যোগাযোগের অন্যতম উপাদান অ্যাডভোকেসির আরেকটি অর্থ হলো– ভালো কিছু করা, এই অ্যাডভোকেসি শুধু সমস্যা হলেই তার আপাতত সমাধানের জন্য কাজে লাগে এমন নয়। মূলত আমাদের কাজগুলো কতটা কার্যকর এবং কত বেশি মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছাতে পারি, সেই নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রচারের কাজ সফলভাবে করতে স্বাস্থ্য যোগাযোগের সহায়তায় আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের টিমের সদস্যরা সঠিকভাবে ভূমিকা রাখছে কি না, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের সঙ্গে জড়িত অন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কে কীভাবে জড়িত এবং কার কী করণীয়, কে কতটুকু সঠিকভাবে করতে পারছে, তা বুঝতে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্কে সিএইচসিপি, স্বাস্থ্যসহকারী, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, এফডব্লিউভি, এসবিএ, সাব-অ্যাসিসট্যান্ট মেডিকেল অফিসার ও মেডিকেল অফিসাররা মাঠপর্যায়ে, বাড়ি বা কমিউনিটি পর্যায়ে যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক অনুসরণ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেন, সেটিই স্বাস্থ্য উন্নয়ন যোগাযোগ হিসেবে মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হিসেবে আলোচিত হয়ে থাকে।

প্রোথিত অ্যাডভোকেসিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে উন্নয়ন সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, গণযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান, সংবাদ সংস্থা, নিউজপেপার, রেডিও, টেলিভিশন, উন্নয়ন সহযোগী– সবার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করতে কাজ করে থাকে

প্রোথিত অ্যাডভোকেসিকে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে যখন গ্রহণ করা হয়, তখন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম তাদের সময়ের অপচয় রোধ করে অল্প সময়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তারা কমসংখ্যক মানবসম্পদের ব্যবহার করে অধিক কার্যকর ফল অর্জন করতে সক্ষম হয়, অর্থের অপচয় রোধ করতে পারে, কম উপাদান ব্যবহার করে প্রকল্পের সর্বোচ্চ ভিজিবিলিটি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় এবং কোনো ধরনের ইতিবাচক সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন না। অর্থাৎ প্রকল্পের কার্যক্রম সস্তায়, দ্রুততার সঙ্গে, সহজে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরাপদে টেকসই ফল লাভের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি। প্রোথিত অ্যাডভোকেসি এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম তাদের সম্মিলিত শক্তি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সমন্বিত মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে অবদান রাখতে পারে।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন যোগাযোগ বা অ্যাডভোকেসি প্রথমত প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সদস্যদের বা সংস্থার সঙ্গে জড়িত সবার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে কাজ করে। টিমের কোথায় দুর্বলতা, কাজের কোথায় গ্যাপ, বেনিফিশিয়ারিদের প্রতিক্রিয়া কোন ধরনের, অন্য স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পের কার্যক্রমকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে ইত্যাদি ডকুমেন্টেশন থেকে জানা সম্ভব হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দল বা সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

যোগাযোগ কার্যক্রম শুধু প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে এমন নয়। যোগাযোগ কার্যক্রম বা অ্যাডভোকেসি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম ও সংস্থার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও এর বাইরে যারা রয়েছেন, তাদেরকেও জানতে ও বুঝতে সহায়তা করে থাকে। সংশ্লিষ্ট লাইন মিনিস্ট্রি, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, সহযোগী সংস্থা, দাতা সংস্থার সদস্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত রাখার কাজ করে থাকে। তাদের সঙ্গে প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়, অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করা, নিয়মিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা, যা থেকে তারা প্রকল্পের পূর্বাপর দুর্বলতা, চ্যালেঞ্জগুলো সবাই বুঝতে পারেন, বাস্তবিক পক্ষে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা অনুধাবন করতে পারেন। ফলে প্রকল্পের জন্য চলমান সহায়তা যাতে অব্যাহত থাকে, প্রকল্পের জন্য কৌশলগত কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করার সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতে পারেন। মূলত কৌশলগত অ্যাডভোকেসির কাজ হলো সক্ষমতা বাড়ানো ও ক্ষমতায়িত করা, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা, অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা নিশ্চিত করা, প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সহায়তা করা, প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র মানুষের চাহিদা কী, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সব পর্যায়ে সর্বাধিক পরিমাণে অবহিত করা। এতে প্রকৃতপক্ষে যাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, সেই মানুষের জীবনের আসলেই কোনো পরিবর্তন সাধিত হলো কি না বা কতটুকু করা সম্ভব হলো, তা বুঝতে সহজতর হয়। এভাবেই অ্যাডভোকেসি সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কত বেশি মানুষের জীবনে স্বাস্থ্যঝুঁকির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব, সেই লক্ষ্য অর্জনে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের অগ্রগতি

সত্তরের দশকের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো অবদান রেখে আসছে। ছোটো-বড়ো, স্থানীয়-জাতীয়, দেশি-বিদেশি মিলে ৩৫ হাজারের বেশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এখনো আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্যদূরীকরণ, মানবিক সহায়তাসহ নানা বিষয়ে সরকারকে সহায়তার পাশাপাশি হতদরিদ্র মানুষের ন্যূনতম মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অবদান রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায়, কখনোবা নিজস্ব অর্থায়নে এসব উন্নয়ন সংস্থা এককভাবে বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশীদার, সরকারি বা নাগরিক সমাজের সঙ্গে সম্পদ ভাগ করে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কাজ করে। এসব কাজকর্ম করতে সরকারের জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করা, সরকারের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে বৈশ্বিক উন্নয়নের গতিবিধির সঙ্গে তাল রেখে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যোগাযোগ ও তথ্যাধিকার নিশ্চিত করা, গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সব কাজে সহায়তা করে আসছে এসব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। আর এসব কাজ করতে উন্নয়ন সংস্থাগুলো যেসব কৌশল

অবলম্বন করে থাকে, তার মধ্যে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি অন্যতম কৌশল হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রোথিত অ্যাডভোকেসিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে উন্নয়ন সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, গণযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান, সংবাদ সংস্থা, নিউজপেপার, রেডিও, টেলিভিশন, উন্নয়ন সহযোগী– সবার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করতে কাজ করে থাকে। প্রোথিত অ্যাডভোকেসি এখানে স্থানীয় পর্যায়ে ডায়ালগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। গ্রামভিত্তিক কার্যক্রমকে উপরের দিকে নিয়ে আসে অ্যাডভোকেসির সহায়তায়। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ, মিটিং, শেয়ারিং সেশনে গ্রামীণ মানুষের জীবনধারাগুলো পর্যালোচিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন কাজে সহায়তা (আর সেখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে) করে আসছে এই উন্নয়ন যোগাযোগ হিসেবে পরিচিত প্রোথিত অ্যাডভোকেসি।

পথনাটক, পটগান, কবিগান, গম্ভীরা প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এসব যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সহজে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হয় এবং মানুষের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে

স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োজিত সংবাদকর্মী, উন্নয়নকর্মী, গবেষণাকর্মী, শিক্ষক, ধর্মনেতা, জননেতা, জনপ্রতিনিধিসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মেলন ঘটানো হয় প্রোথিত অ্যাডভোকেসির ছোটো ছোটো কাজের দ্বারা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম, সংবাদ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত এসব অগ্রগতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরার জন্য। এককথায়– জাতীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গৃহীত কৌশলগুলো যেমন স্থানীয় উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়, তেমনি স্থানীয় উন্নয়নের অভিজ্ঞতাগুলো জাতীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে অবহিত করা জরুরি। আর এই গুরুত্বপূর্ণ মিথস্ক্রিয়াটি ঘটে থাকে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি কাজের মাধ্যমে। বাংলাদেশ গত তিন-চার দশকে এ কাজটি প্রোথিত অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সার্থকভাবে ঘটাতে পেরেছে। প্রোথিত অ্যাডভোকেসির দ্বারাই তৃণমূলের মতামত নীতিনির্ধারণীর দৃষ্টি কাড়ে আবার নীতি প্রণয়নে তৃণমূলের এসব মতামত দেশ গঠনে বা টেকসই উন্নয়ন সূচক, অভীষ্টগুলো অর্জন করতে সহায়তা করে। আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার ক্ষেত্রেও প্রোথিত অ্যাডভোকেসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাউকে বাদ দিয়ে ভিশন-২০৩০ অর্জন করা সম্ভব হবে না। সবার জন্য স্বাস্থ্য, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জন করতে হলে প্রোথিত অ্যাডভোকেসির কৌশলই হবে অন্যতম, যেখানে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। আর সরকারের সঙ্গে উন্নয়ন সংস্থাগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে পরের ধাপের কাজগুলো সম্পাদন করা সহজতর হবে।

প্রোথিত অ্যাডভোকেসি ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসূত্রে নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রচারণা চালিয়ে থাকে। আর প্রচারণার কাজের অংশ হিসেবে সেক্টর, সাব-সেক্টরের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং অ্যালায়েন্সের সহযোগিতায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করতে সবাইকে সংগঠিত করে থাকে। সমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যের জোগান দিয়ে সচেতনতা তৈরির কাজে সহায়কের ভূমিকায় সম্পৃক্ত থাকে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি। এজন্য স্থানীয়, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে এমনকি জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণার উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে যাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, সেজন্য অবদান রাখে আর স্বাস্থ্যঝুঁকির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই।

পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধান করতে সরকারের পাশাপাশি যেসব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা, তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিচারপ্রাপ্তি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবিক সমাজ গঠনের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে ওকালতি করে থাকে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি। প্রোথিত অ্যাডভোকেসি নানা ধরনের উন্নয়ন উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে অবদান রাখে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সবাইকে একটি প্লাটফর্মে আনতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে উৎসাহিত করে। আবার কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়নের স্থানীয় উদাহরণগুলো আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী মহলের দোরগোড়ায় যাতে পৌঁছে, সেজন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা-পর্যালোচনা ও শেয়ারিংয়ের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন ইস্যুতে গোলটেবিল, টকশো, ওয়ার্কশপের আয়োজন আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। এগুলোর মূল উপাদানগুলো প্রোথিত অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে চিহ্নিত হয় এবং পর্যালোচনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আনতে দরকারি সব কাজ করে থাকে উন্নয়ন সংস্থাগুলো। এভাবে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে অবদান রেখে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ের বহুমুখী কার্যক্রমের ইতিবাচক বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি-পেশার মানুষকে একীভূত করতে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি কখনো গবেষণা, কখনো প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টেশন, কেস স্টাডি তৈরি, প্রতিবেদন তৈরি, মেলার আয়োজন, আলোচনা সভা বা শ্রেণিকক্ষের পাঠদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে কাজ পরিচালনা করে। স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে কর্মসূচির অধীনে নানা রকম তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ যেমন– লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট, নিউজলেটার, সাইনবোর্ডসহ নানা উপকরণ তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রোথিত অ্যাডভোকেসি স্থানীয় মানুষের কাছে উন্নয়ন তথ্য পৌঁছতে লোকজ মাধ্যম যেমন– পথনাটক, পটগান, কবিগান, গম্ভীরা প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এসব যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সহজে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হয় এবং মানুষের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে।

মানবাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিষয়ে সবার সামনে তুলে ধরা হয়ে থাকে। অ্যাডভোকেসি টিম এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া প্রোথিত অ্যাডভোকেসির মূল অভীষ্টে পৌঁছানো কঠিন। বাংলাদেশের হাজার হাজার নিউজপেপার, বেতার কেন্দ্র, সরকারি-বেসরকারি মিলে ৪০টির বেশি টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও কাজ করছে, যার বড়ো একটি জায়গা দখল করে থাকে উন্নয়নবিষয়ক প্রচার-প্রচারণা। ফলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যায় স্থানীয় উন্নয়ন কৌশল ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তনের গল্পগুলো। আশা করা যায়, ভিশন-২০৩০ অর্জনে প্রোথিত অ্যাডভোকেসি বরাবরের মতো ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে যাবে। আর এজন্য জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিগুলো হ্রাসকল্পে এবং ঝুঁকি মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধাচার করতে হবে। যেমন– স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত ও সহজবোধ্য করা। তাহলেই স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে আমাদের জনসাধারণকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১. Safe water for Community Clinic, ACC WASH guideline, Community Clinic Health Support Trust, April 2019.
২. Sustainable Development Goals and Targets, General Economic Division (GED), Planning Commission, Bangladesh.
৩. http://www.worldwaterday.org/theme/stories/: world water day 2019: Leaving no one behind.
৪. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24161&LangID=E
৫. http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2019/02/WWD2019_factsheet_EN_vs4_29Jan2019.pdf
৬. WHO/UNICEF: https://washdata.org/monitoring/drinking-water
৭. UN (2010): A/RES/64/292 Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
৮. OHCHR, UN Habitat, WHO: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
৯. WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
১০. UNICEF (2018) WASH in Schools: Global baseline report 2018: https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
১১. Calculation made in 2018 based on data from UNICEF: https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
১২. WHO (2017) Safely managed drinking water - thematic report on drinking water 2017: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/ safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
১৩. WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
১৪. UNICEF: https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
১৫. UNHCR (2017) Global Trends Report: Forced Displacement in 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
১৬. WWAP (UNESCO World Water Assessment Programme)/UN-Water (2019) The United Nations World Water Development Report 2019: Leaving No One Behind
১৭. WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp2017/en/
১৮. Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion people facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/26933676
১৯. Global Water Institute (2013) Future water (in)security: facts, figures and predictions: https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069- 45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
২০. WWAP (UNESCO World Water Assessment Programme)/UN-Water (2019) The United Nations World Water Development Report 2019: Leaving No One Behind.
২১. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene Update and SDG Baselines:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=0AC787E890F363C91A7CA37FDAEA5E21?sequence=1
২২. UNHCR (2017) Global Trends Report: Forced Displacement in 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
২৩. WWAP (UNESCO World Water Assessment Programme)/UN-Water (2019) The United Nations World Water Development Report 2019: Leaving No One Behind
২৪. World Economic Forum: Three steps of poverty reduction in Bangladesh.
২৫. Role of information and communication technologies in Rural poverty alleviation: Mohammad Atiur Rahman, BRAC Development Institute, BRAC University.
২৬. মানতা সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র ও আমাদের গণমাধ্যম: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১৩৯তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫।
২৭. Communication Strategy for Development Programs, A guideline for Programme Managers and communication officers, UNICEF Bangladesh, 2008.
২৮. Community Disaster Risk Management and the media, Partnership for disaster reduction Southeast Asia phase-3, Bangkok, Thailand, 2006.
২৯. Reducing Vulnerability to climate change: the project implementation plan, CARE Bangladesh, Asia Brach 2002.
৩০. Using strategic communication to fight poverty through PRSPs, by Masud Mozammel & Sina Odugbemi, Information and communication for development, DFID, - 2005.
৩১. Inclusive WASH in Bangladesh: the perspective and advocacy, by Mohammad Abdul Mannan, published in - WatSan, quarterly Newsletter by NGOF, March-May 2019, Dhaka.
৩২. OPERATIONAL GUIDELINES FOR WASH (Water Sanitation and Hygiene) IN EMERGENCIES - BANGLADESH Second Edition 2017.
৩৩. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র-২০১৪, জাতীয় হাইজিন প্রমোশন কৌশলপত্র-২০১২।

লেখক: উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষক

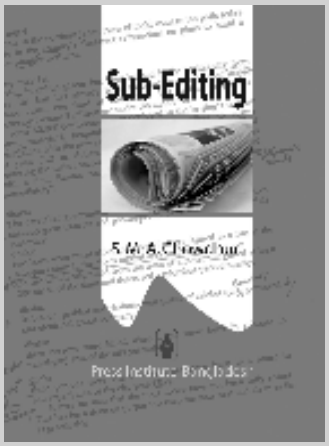

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখা এবং স্বাস্থ্যপাতার ক্রমবিকাশ

ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম

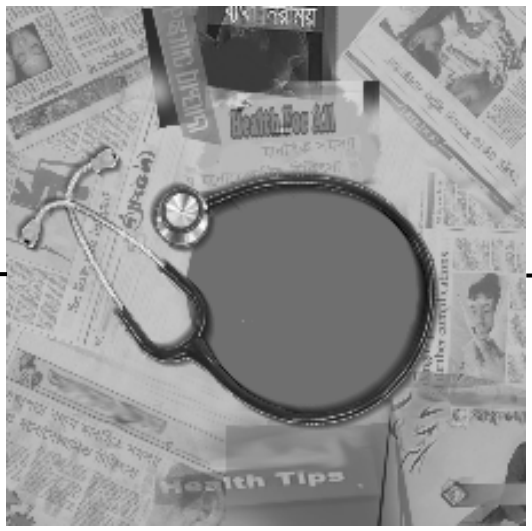

১৯৮৩ সালের কথা। আমি তখন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নবীন ছাত্র। একদিন ইমার্জেন্সির সামনে দিয়ে হাঁটছি। চোখে পড়ল এক মা তার বছরতিনেকের কোলের শিশুকে নিয়ে ইমার্জেন্সির বাইরে বসা। বাচ্চাটি কাঁদছে। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে? বাচ্চাটির মা বললেন, বাবা দেখ আমার বাচ্চাটির হাতে ব্যথা, পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেছে। ডাক্তারকে দেখাতে এসেছি। উনি ভর্তি করতে চাচ্ছেন না। ইমার্জেন্সির ডাক্তার কেন ভর্তি করতে চাচ্ছেন না, তা-ও ওই মায়ের কাছ থেকে জেনেছিলাম। বিষয়টি ছিল আমার মতো গ্রামের অজপাড়াগাঁ থেকে আসা এক নবীন ছাত্রের জন্য খানিকটা বিব্রতকর। আপনারা হয়তো জানেন, মেডিকেলে পড়তে আসা সব নবীন ছাত্রছাত্রী নিজেদেরকে মানবতার মহান সেবক হিসেবে ভাবতে থাকে। অনেকে ভাবে এফআরসিএস, এমআরসিপি হয়ে গেছে। আমার অবস্থাও তাই। ওই শিশুটির কষ্ট দেখে খানিকটা সাহস নিয়ে ইমার্জেন্সিতে ডিউটিরত চিকিৎসকের কাছে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, বাচ্চাটিকে ভর্তি করা যায় না? স্পষ্ট মনে আছে, ডিউটিরত ওই ইমার্জেন্সি চিকিৎসক আমাকে তিরস্কার করে রুম থেকে বের করে দিলেন। যে ভাষা ব্যবহার করলেন, তা এখানে উল্লেখ করে চিকিৎসকদের ছোটো করতে চাই না। আরও বললেন, সবে তো ফার্স্ট ইয়ারে, আমার চেয়ারে বসো, দেখবে দয়ামায়া সব উবে যাবে। পাশে থাকা ওয়ার্ডবয় বিষয়টি বুঝতে পেরে আমাকে বললেন, স্যার (ডিউটি ডক্টর) কিছু পেলে বাচ্চাটাকে ভর্তি করতে অসুবিধা হবে না।

কলেজ-জীবনে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম প্রতিবাদ করব। কিন্তু ততক্ষণে অন্য সহপাঠীরা আমাকে থামিয়ে দিল। সেদিন ভেবেছিলাম ছোট্ট বাচ্চাটির ওপর জরুরি চিকিৎসকের এ অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণটি যদি পত্রিকায় লেখা যেত, তাহলে মনটা কিছুটা হলেও শান্তি পেত। পরবর্তী সময়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আমার সে আশা পূরণ করেছেন। সর্বশেষ চাকরি হারানোর আগ পর্যন্ত আমি স্বনামধন্য আমার প্রিয় পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ও চিফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

এখনো কমবেশি লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছি স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকা ও স্বাস্থ্যপাতায়। একসময় সাংবাদিকতাকে নেশার মতো মনে হতো। সম্ভবত আমি বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসক, যিনি পেশা পরিবর্তন করে সার্বক্ষণিক সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হই। আমার সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে (মেডিকেল রিপোর্টিংসহ) দেশের

স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসা, রোগতত্ত্ব ও রোগবিষয়ক অনেক লেখা আমি লিখেছি। আমি সম্ভবত দেশের প্রথম স্বাস্থ্যপাতা সম্পাদনার দায়িত্ব পাই। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রয়াত দেশবরেণ্য সাংবাদিক আমার সাংবাদিকতা উন্নয়নের রূপকার শ্রদ্ধেয় গোলাম সারওয়ার তখন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংবাদ সম্পাদনা, হেডলাইন তৈরি ও সংবাদপত্রের পাতা বিন্যাসে সারওয়ার ভাই ছিলেন ঈর্ষণীয় এক জাদুকর। সারওয়ার ভাইয়ের সে জায়গাটি কখনো কেউ স্পর্শ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সারওয়ার ভাই আমাকে ডাকলেন। আমি তখন আওয়ামী লীগের বিটের সঙ্গে যুক্ত। ভাবলাম হয়তো কোনো পলিটিক্যাল রিপোর্টের অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন। না, কোনো পলিটিক্যাল রিপোর্ট নয়। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো দেশের প্রথম স্বাস্থ্যপাতা সম্পাদনার। সারওয়ার ভাই বললেন, সম্পাদক সাহেব (উনি মঞ্জু ভাই বলতেন) অর্থাৎ আমার প্রিয় পত্রিকার সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু স্যার চান ইত্তেফাকে সপ্তাহে একদিন পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যপাতা বের হোক। সম্পাদকের নির্দেশ শুনে আমার শরীরে একদিকে উত্তেজনা, অন্যদিকে হিমশীতল অবস্থা। কীভাবে স্বাস্থ্যপাতা বের করব। কোথায় পাব প্রতি সপ্তাহে এত লেখা। চিন্তায় দু-তিন রাত ঘুমাতে পারিনি। স্ত্রী বলত, তোমার কী হয়েছে, রাতে ঠিকমতো ঘুমাও না। একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। আশি-নব্বইয়ের দশকে স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখার লেখক ছিলেন হাতেগোনা দু-তিনজন। আমার জানামতে, জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, স্বনামধন্য মেডিকেল কলামিস্ট অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা সুলতানা জাহান, কলামিস্ট ডা. আহমেদ রফিকসহ আরও দু-একজন। স্বাস্থ্যপাতা সম্পাদনার বিষয়বস্তু নিয়ে সারওয়ার ভাই আমাকে একটি সুন্দর গাইডলাইন দিলেন। কিন্তু শুধু গাইডলাইনে তো আর কাজ হয় না। চিকিৎসক-লেখক দরকার। যাই হোক, সেসব বড়ো ইতিহাস। দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পরে কখনো লিখব। সারওয়ার ভাই এবং সম্পাদকের ইচ্ছাকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম স্বাস্থ্যপাতার প্রথম দু-তিনটা সংখ্যা নিজে লিখে বের করব, আর পাশাপাশি লেখক অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাব। সারওয়ার ভাইয়ের নির্দেশনা এবং সিনিয়র চিকিৎসকদের সহযোগিতায় খুব দ্রুতই অনেক মেডিকেল লেখক বেরিয়ে এলেন। আমার কিছুটা পরে ডা. সজল আশফাকও মেডিকেল লেখনীতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। সজল জনকণ্ঠের স্বাস্থ্যপাতার সম্পাদনা করত। একে একে অন্য সব জাতীয় দৈনিক স্বাস্থ্যপাতা বের করা শুরু করল। আজকের পরিসংখ্যান বলে, দেশের শতাধিক জাতীয় দৈনিকে স্বাস্থ্যপাতা প্রকাশিত হয়। ডা. আব্দুন নূর তুষারের মতো সেলিব্রেটি টেলিভিশন ব্যক্তিত্বও মেডিকেল লেখালেখিতে এগিয়ে আসেন। অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, অধ্যাপক মবিন খান, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার এ মালিক, জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান, অধ্যাপক হারুনর রশীদ, অধ্যাপিকা সামিনা চৌধুরী, অধ্যাপক ফজলুল হক, অধ্যাপক সেলিম শাকুর, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, অধ্যাপক আজাদ খান, অধ্যাপক ইকবাল হাসান মাহমুদসহ অনেক দেশবরেণ্য চিকিৎসকও চিকিৎসাবিষয়ক লেখনীতে ব্যাপক অবদান রাখেন। মেডিকেল লেখকের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। হয়তোবা আরও বেশি হবে। এর বাইরেও প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে থাকে নানা ধরনের হেলথ টিপস। শুধু জাতীয় দৈনিক বলছি কেন, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোও প্রচার করে বিশেষ স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের হেলথ টিপস। তাই বলা যায়, দেশের চিকিৎসাবিষয়ক লেখালেখির বিপ্লব ঘটেছে। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে এসব স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখনী ব্যাপক অবদান রাখছে, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আর আমি এ প্রক্রিয়াটির সূচনার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আজ নিজেকে সত্যিই গৌরাবান্বিত মনে করি।

সবচেয়ে আশার কথা, বাংলা-ইংরেজি বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত স্বাস্থ্যপাতা বা হেলথ পেজ বের হচ্ছে। এসব স্বাস্থ্যপাতার মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত মানসম্মত। তবে এটা বলতেই হবে, অনেক জাতীয় দৈনিকের স্বাস্থ্যপাতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মানসম্মত নয়। স্বাস্থ্যপাতার মান বাড়াতে হলে অবশ্যই একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে। কীভাবে স্বাস্থ্যপাতা সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি নেওয়া যায়, এদিকে বেশি নজর দিতে হবে। সাধারণ রোগ সমস্যা, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ, ওষুধ, লাইফ স্টাইল, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারসহ নানাবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত সংবলিত প্রেসক্রিপশন বা পরামর্শ, ইন্টারেস্টিং মেডিকেল কেস, মেডিকেল শিক্ষাবিষয়ক লেখা, রোগীদের মতামতধর্মী কলামও স্বাস্থ্যপাতায় রাখা যেতে পারে। প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত নিবন্ধ ও টিপসও থাকতে পারে। মোদ্দাকথা, একটি সুন্দর ও সাধারণ মানুষের উপযোগী লেখাসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যপাতা সবারই কাম্য। পাশাপাশি থাকতে হবে এ ধরনের পাতার উন্নয়নে সম্পাদনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় সম্পাদকদের বিষয় নির্ধারণের স্বাধীনতা। এমনকি স্বাস্থ্যপাতা কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে জনমত জরিপও হতে পারে। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, সাধারণ মানুষের উপকার হয় এমন একটা স্বাস্থ্যপাতার বিষয় নির্ধারণ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যা যা করণীয়, এর সবই করতে হবে। তা হলে স্বাস্থ্যপাতা আরও পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সবশেষে যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে, দীর্ঘদিন একঘেয়েমি লেখা নয়। বিষয় নির্বাচনেও থাকতে হবে বৈচিত্র্য। তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্যপাতা পাঠকের মনে জায়গা করে নিতে পারবে, অন্যথায় নয়।

লেখক: চিকিৎসক ও সিনিয়র সাংবাদিক

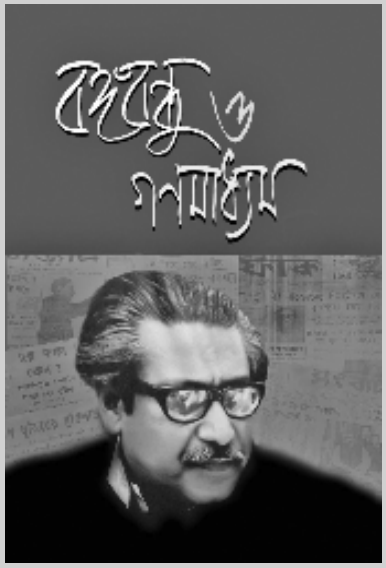

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মানসিক স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যম

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

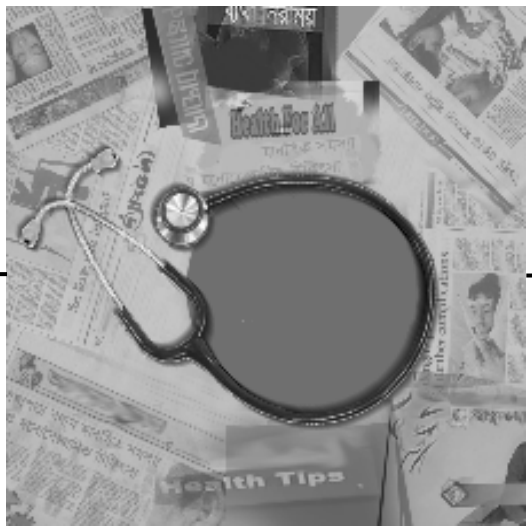

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জনগণের তথ্য পাওয়ার প্রাথমিক-মুখ্য উৎস হচ্ছে সংবাদমাধ্যম। মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অপবাদমূলক মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে জোরাল ভূমিকা রাখে। মানসিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণে মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরিতেও সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখে গেছে, রাজ্যভেদে তাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য পায় টেলিভিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, শতকরা ৫৮ জন পায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে; ৩৪ জন ম্যাগাজিন এবং ২৫ ভাগ মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য পায় ইন্টারনেট থেকে।

প্রকৃতপক্ষে, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে উল্লিখিত মাধ্যমগুলোই হচ্ছে আমাদের তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ার উপায়। আর এসব মাধ্যমে তথ্য সংগ্রাহকের ভূমিকায় আছেন আমাদের সংবাদকর্মীরা। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আমাদের দেশের ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য না হলেও ধারণা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে যে, বিশ্বের প্রায় অনেক দেশের মতো আমাদের জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেট থেকেই সব ধরনের তথ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়েও তথ্য পেয়ে থাকেন। আজকের আলোচনার অবতারণা কেবল মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং এর চিকিৎসাসেবার প্রমোশনে সংবাদকর্মী বা সংবাদপত্রের ভূমিকা বিষয়ে।

সাধারণত আমরা দেখে থাকি, কোনো সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা রেডিও-টেলিভিশনে একজন সাংবাদিক বা উপস্থাপক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে কিছু প্রশ্ন করেন যেগুলোর উত্তর তিনি দিয়ে থাকেন। এতে সাধারণ মানুষ যে তথ্যগুলো পায়, তা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু শেখা যায় ঠিকই তবে সেটুকু পর্যাপ্ত নয়। কারণ হিসেবে বলা যায়, ছকবদ্ধ কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলতে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের উপযোগী করে পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারে না। বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আচরণ পরিবর্তন খুবই দুরূহ। এক্ষেত্রে একটি মানসিক রোগের শুরু, লক্ষণ, বিস্তারিত কারণ, এর স্বল্পমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক দিক, দৈনন্দিন জীবনযাপনে এর প্রভাব, ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবারের সদস্য

অথবা তার কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে পেশাগত যোগাযোগ রক্ষাসহ নানাবিধ বিষয় জড়িত রয়েছে। আবার একই রোগের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। সময়স্বল্পতা কিংবা লেখার সাইজ-আকারের সীমাবদ্ধতা অথবা দর্শক-পাঠকের অনুষ্ঠান দেখা বা প্রকাশিত লেখাটি পড়ার ধৈর্য এক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা হলেও এগুলোর উত্তরণ খুবই জরুরি। সেজন্য দরকার যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে খুব বিশদভাবে, প্রয়োজনে অল্প পরিমাণে ইতিবাচক ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন। 'ইতিবাচকভাবে' শব্দটি এ কারণেই বললাম, উপর্যুক্ত তথ্যসূত্র মতে, সাধারণত গণমাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক উপস্থাপনাগুলো নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষ, এসব রোগে ভুগছেন– এমন মানুষ, এমনকি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টির প্রতি একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হন আমাদের রোগীরা। ভোগান্তিতে পড়েন তাদের আত্মীয়স্বজন। কারণ তখন রোগী চিকিৎসাটি নিতে ভয় পান এবং আত্মীয়স্বজনও তাদেরকে চিকিৎসা গ্রহণে রাজি করাতে বা চিকিৎসকদের কাছে আনতে পারেন না। তাই সংবাদ সংগ্রাহক পেশাজীবী সুধীজনদের উদ্দেশ্যে বলছি, কোনো রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে বিস্তারিত, ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবাচক তথ্য পরিবেশন করুন।

মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীজুড়েই অপবাদ কিংবা বৈষম্যের চর্চা লক্ষণীয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং দীর্ঘদিনের মানসিক সমস্যার চিকিৎসাচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাটি স্পষ্টই বলা যায় যে, আমাদের দেশের অনেক মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মানুষ মানসিক সমস্যার চিকিৎসা নিতে আসেন না কেবল অপবাদ বা বৈষম্যের শিকার হবেন বলেই। পাছে তাদের ভয় থেকেই যায় যে, 'যদি সবাই আমাকে পাগল মনে করে।' সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক এটি যে, আশপাশের মানুষ এ নিয়ে যতখানি আতঙ্ক তৈরি করে, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকা মানুষটির পরিবারের সদস্যরা। নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে মা-বাবাও এর ব্যতিক্রম নন। আর এ ধরনের অপবাদমূলক চর্চার কারণে দেশের অনেক মানসিক রোগীই মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণে ভয় পান। ফলে মৃদুমানের মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের মানসিক সমস্যার তীব্রতা বেড়ে যায় বহুগুণ। শুরুর দিকে মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা গ্রহণ করলে শুধু কয়েকটি কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি সেশনের মাধ্যমে এবং ওষুধ ছাড়াই যেমন চিকিৎসা করলে রোগী ভালো হয়ে যেতে পারত, সেখানে তখন বিষয়টি আরও জটিল হয়ে যায়। ফলে ভোগান্তি বাড়ে রোগীর নিজের, তার পরিবারের সদস্যদের। এমনকি চিকিৎসা ব্যয়ও বেড়ে যায় বহুগুণে। অতএব অপবাদ বা বৈষম্য দূরীকরণে এক্ষেত্রে বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সচেতনতা জরুরি। আর এ ধরনের সচেতনতামূলক জ্ঞান সহজেই অর্জন সম্ভব মিডিয়ার বদৌলতে। বেশি বেশি এবং নিয়মিত প্রকাশনা এ ধরনের অপবাদজনিত কুসংস্কার থেকে আমাদেরকে বের হতে সাহায্য করবে এবং ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রটিকে দুর্বল করে দেবে। একইভাবে অপবাদজনিত কুসংস্কারের সঙ্গে আমাদের মানসিক প্রস্তুতিকে সহজীকরণের একটি অবস্থা তৈরি করবে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, অপবাদমূলক এবং নেতিবাচক তথ্য মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণের উৎসাহকে বাধাগ্রস্ত করে। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত থাকায় রোগীর কোনো বিরূপ আচরণ যেমন– কাউকে আঘাত করা, আগ্রাসী আচরণ করা, কাউকে খুন করা– এসব খবর বেশি প্রচার পেলে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্য মানসিক রোগীদের মধ্যে, এমনকি সমাজেও। গবেষণায় দেখা গেছে, বিনা অপবাদমূলক লেখনী বা তথ্যের প্রচার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এজন্য ইতিবাচক সংবাদতথ্য পরিবেশনা মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অনেকেই আবার জানেন না যে, কোন অবস্থায় মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণ প্রয়োজন? কোন ধরনের মানসিক সমস্যার জন্য কী ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ প্রয়োজন? কোথায় গেলে মানসিক সমস্যা সমাধানে চিকিৎসা পাওয়া যাবে? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও জানা সম্ভব সাংবাদিকদের নিয়মিত লেখনীর মাধ্যমে। অতএব মানসিক সমস্যার সুস্থতায় সংবাদপত্রের অবদান অপরিসীম। এবার একটু বুঝতে চেষ্টা করি যে, 'কখন বুঝব আমি মানসিকভাবে অসুস্থ এবং আমার চিকিৎসা নেওয়া দরকার? কোথায় এবং কাদের কাছে চিকিৎসা নেব? কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপির প্রক্রিয়াগুলো কী বা কেমন?'

প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে নিজে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। কর্মজীবী মানুষের ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ করে উপার্জনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য। ধরি, একজন ছাত্র কোনো উপার্জন করে না। এক্ষেত্রে নিয়মিত পড়াশোনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি হচ্ছে তার দৈনন্দিন কাজের অংশ। দৈনন্দিন জীবনযাপনে একজন মানুষ বিভিন্ন সময়ে নানা মানসিক টানাপোড়েনে ভুগে থাকেন। যেমন– মন খারাপ থাকা, ঘন ঘন রাগ হওয়া, বিষাদগ্রস্ততা, হতাশা, আতঙ্ক বা ভয় ইত্যাদি আরও নানা কারণে এগুলো হয়ে থাকে। এসবের প্রায় অধিকাংশই সাধারণত একজন মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক বা আবেগীয় সংকটের কারণে হয়। আর এসব কারণে তার দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তার খাওয়াদাওয়া, ঘুম, তার পরিবারের সদস্য অথবা আশপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে। সহজ কথায় বলা যায়, শারীরিক সমস্যার বাইরে মানসিক বা আবেগের কারণে একজন ব্যক্তির করণীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন বোঝা দরকার যে উনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এক বা দুই দিন এ সমস্যাগুলো হলেই যে সে মানসিকভাবে অসুস্থ এবং তাকে চিকিৎসা নিতে হবে– এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। যেমন– বিষণ্নতা রোগের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, একজন ব্যক্তির মধ্যে ১৩টি লক্ষণের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি লক্ষণ দুই সপ্তাহ বা তার অধিক সময় থাকলে তার বিষণ্নতা রোগ আছে বলে ধরা হয়ে থাকে। তবে বিষণ্নতা রোগেরও অনেক ধরন রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি নিজের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত একাধিক লক্ষণ বিবেচনা করেন এবং বিশেষত তার দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষতি বা উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অবস্থা বিবেচনা করেন, তাহলে তার অবশ্যই একজন মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এখানে মূল কথাটি হচ্ছে– মানসিক বা আবেগের কারণে যখন একজন মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনই তার মানসিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। তবে মানসিক চিকিৎসা গ্রহণের এই ধাপে এটি বোঝা খুব দরকার যে, মানসিক চিকিৎসকদের আবার দুইটি ডিসিপ্লিন রয়েছে। একটি হচ্ছে মনোচিকিৎসক বা সাইকিয়াট্রিস্ট; আরেকটি হচ্ছে চিকিৎসা মনোবৈজ্ঞানিক বা মনোবৈজ্ঞানিক ডিসিপ্লিন। মনোচিকিৎসক বা সাইকিয়াট্রিস্টরা মানসিক রোগ সমাধানের জন্য সাধারণত ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন এবং পাশাপাশি কিছু সময়ের জন্য কাউন্সেলিং করে থাকেন। ওনারা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং ওষুধ প্রেসক্রাইব করার জন্য মনোনীত ব্যক্তি। আর চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) বা সহকারী চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী অথবা সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা ওষুধ প্রেসক্রাইব করার জন্য মনোনীত ব্যক্তি নন এবং ওনারা মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রদানে সাইকোথেরাপি প্রয়োগ করে থাকেন। সাইকোথেরাপি হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ও মতবাদ (থিওরি ও প্রিন্সিপাল) প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনোরোগের

মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অপবাদমূলক মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে জোরাল ভূমিকা রাখে। মানসিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণে মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরিতেও সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে

প্রকৃতি, লক্ষণ, কারণ অনুসন্ধান করে সমাধানের এক ধরনের প্রক্রিয়া, যা সাধারণত কথা বলার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার একটি আদর্শ মানদণ্ড হচ্ছে– একজন থেরাপিস্ট বা চিকিৎসক একজন রোগীর (তবে সাইকোথেরাপি চিকিৎসাসেবায় চিকিৎসাপ্রার্থীকে সাধারণত রোগী বলা হয় না, ক্লায়েন্ট বলা হয়ে থাকে) সঙ্গে সপ্তাহে একদিন ৫০ মিনিটের একটি আলোচনায় বসেন, যেটিকে একটি সেশন বলা হয়। সাধারণত ৮-১২টি সেশনের মধ্যে একজন ক্লায়েন্টের সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে রোগের তীব্রতার মাত্রানুযায়ী কখনো কখনো এর বেশি সেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, সেশনগুলো নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে নিতে হবে। তাহলে সর্বোচ্চ কার্যকারিতা পাওয়া যাবে। কথা হচ্ছে– দেশব্যাপী চিকিৎসাব্যবস্থা ঢাকামুখী হওয়ায় যারা সাধারণত ঢাকা বা এর আশপাশে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিকভাবে নিয়মিত সেশন নেওয়া সম্ভব হতে পারে। প্রশ্ন হলো– যারা ঢাকার বাইরে বা দূর-দূরান্ত থেকে আসবেন, তারা কী করবেন? এক্ষেত্রেও বলব, সপ্তাহে একদিন বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা না পারলে অবশ্যই দুই সপ্তাহ অন্তর একটি সেশন নিতে হবে। এবার আসি, রোগী না বলে ক্লায়েন্ট কেন বলা হয়? এর কারণ হচ্ছে– শারীরিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে রোগীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। কারণ রোগী কোনোভাবে ওষুধ খেলেই হলো। ওষুধ নিজস্ব গতিতে কাজ করবে। সাইকোথেরাপিতে এমনকি চিকিৎসার প্রয়োজনে ওষুধ লাগলেও একজন মানুষকে নিজ দায়িত্বে ভালো থাকার জন্য চর্চা করতে হয়। মনে রাখবেন, সাইকোথেরাপিস্ট একজন মানুষকে কেবল ভালো থাকার জন্য তাকে কিছু কৌশল শিখিয়ে দেন। সেই কৌশলগুলো রপ্ত করে, সেগুলোকে প্রতিনিয়ত চর্চা করেই একজন মানুষকে ভালো থাকতে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসাপ্রত্যাশী মানুষটিকে নিজের দায়িত্ব নিতে হয়। এ কারণেই সাইকোথেরাপি বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় একজন চিকিৎসাপ্রত্যাশী মানুষকে রোগী না বলে ক্লায়েন্ট বলা হয়। সুতরাং যারাই সাইকোথেরাপি চিকিৎসা নিতে আসবেন, তারা নিজেরা কিছুটা প্রস্তুত হয়ে আসবেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা এমন কাউকে নিয়ে আসেন যাদের মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তির বালাইটুকুও থাকে না। এমন ক্ষেত্রে থেরাপিস্টরা ক্লায়েন্টের মধ্যকার ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে কাজ করেন, যাতে ক্লায়েন্ট সেশনগুলোয় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং চিকিৎসাকে কার্যকর করতে সক্রিয় হন। সাইকোথেরাপির একটি বড়ো শক্তি হলো এটি পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত পথ মেনে চলে। কেউ যদি সাইকোথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করে চলে এবং তার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে, তাহলে সে সারা জীবনের জন্য ভালো থাকতে বাধ্য।

এই তো গেল সংক্ষেপে মানসিক স্বাস্থ্য ও এর চিকিৎসা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কিছু নমুনা। এসবের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে জড়িত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টিকে স্কেল আপ করা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; হেলথ কেয়ার সিস্টেম ও পলিসি তৈরিকারক এবং বিজ্ঞজনদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচিয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করা; মানবাধিকারকে আরও জোরালোকরণসহ অনেক কার্যক্রম আছে যেগুলোর মূল ধরে ঘুণ সরানোর বিষয়ে সংবাদপত্র গভীরভাবে কাজ করতে পারে। যেমন ধরুন, শারীরিক সমস্যা সমাধানে বার্ষিক সরকারি বাজেটের ধারেকাছেও নেই মানসিক সমস্যা সমাধানে সরকারি বাজেটের পরিমাণ। বাজেট বণ্টনে বিষয়টির আনুপাতিক হার বিবেচনা করলেই তো এর অনেকখানি সমাধান সম্ভব। কিন্তু তা হচ্ছে কি? আমরা চিকিৎসকরা এসব বিষয় নিয়ে খুব কমই জানি বা আমাদের কাছে এসব তথ্য খুবই সীমিত পরিমাণে থাকে। সাংবাদিক এর বিশদ তুলে ধরার ক্ষমতা রাখেন, যা সরকারের দৃষ্টিতে আসবে বলে আশা রাখছি। তবে ধারাবাহিক এবং ফলো-আপ নিউজ কাভার করতে হবে।

এসবের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে জড়িত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টিকে স্কেল আপ করা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; হেলথ কেয়ার সিস্টেম ও পলিসি তৈরিকারক এবং বিজ্ঞজনদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচিয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করা

চিকিৎসকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার মানসিকতা ও ভূমিকা রোগীদের রোগমুক্তির ক্ষেত্রে অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করে। যেমন– মানসিক সমস্যা সমাধানকল্পে সাইকিয়াট্রিস্ট ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর সমন্বিত উদ্যোগ চিকিৎসা রোগীদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ধরুন, একজন মানসিক রোগী প্রথমে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে গেলেন। এবার সাইকিয়াট্রিস্ট রোগীর রোগের অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ওনাকে কিছু ওষুধ দিলেন এবং উনি মনে করলেন, ওষুধের পাশাপাশি তার কাউন্সেলিং কিংবা সাইকোথেরাপি প্রয়োজন বিধায় উনি একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর কাছে তাকে রেফার করলেন। এবার চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর কাছে আসার পর উনি কেস হিস্ট্রি নিলেন এবং যথাযথ চিকিৎসা অর্থাৎ সাইকোথেরাপি শুরু করলেন। এ অবস্থায় সবচেয়ে কার্যকর হয় যদি এ দুইজন থেরাপিস্ট (সাইকিয়াট্রিস্ট ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী) একই রোগীর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজটি করেন এবং যুগপৎভাবে চিকিৎসাটি চলিয়ে নিয়ে যান ফলো-আপের মাধ্যমে। সংবাদপত্র এক্ষেত্রে এই কেসটি এবং সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে সফলতার কথা তুলে ধরতে পারে। এতে চিকিৎসকদের যেমন সুনাম বাড়বে, তেমনি রোগীও সুস্থ হয়ে ফিরে যাবেন। চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে। তাতে মানসিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি রোগীদের ভয় দূর হয়ে তারা সাহসী হবেন। রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বোঝাও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে।

বিনোদনমূলক তথ্য ও বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনার মাধ্যমেও সংবাদপত্র মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারে। নাটক, সিনেমা, এনিমেটেড কার্টুন (যেমন– মীনা) ইত্যাদি বিষয় অনলাইনে পরিবেশনার মাধ্যমে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক উপস্থাপনা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে, যা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতেও অবদান রাখে। এসব মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও সচেতন হতে পারে। সর্বোপরি, সংবাদপত্রে আলোচ্য মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে এর বিস্তৃতি ও প্রসারে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. https://www.icanotes.com/2018/04/ 11/ways-mental-illness-is-commonly-misrepresented-in-the-media
২. Anderson M. 'One flew over the psychiatric unit': mental illness and the media. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2003; 10:297-306.
৩. Hannigan B. Mental health care in the community: An analysis of contemporary public attitudes towards, and public representations of, mental illness. Journal of Mental Health 1999;8(5):431-40.
৪. Pirkis J, Francis C. Mental illness in the news and the information media: a critical review. Mind frame National Media Initiative Mind frame, 2012.
৫. Wahl OF. Stop the presses. Journalistic treatment of mental illness. In: Friedman LD, editor. Cultural sutures. Medicine and media. Durkheim, NC: Duke University Press, 2004:55-69.
৬. Corrigan PW, Powell KJ, Michaels PJ. The effects of news stories on the stigma of mental illness. The Journal of Nervous and Mental Disease 2013;201(3):179-82.

লেখক: সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট

টেলিভিশনে স্বাস্থ্য-সংবাদ

তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করে

জান্নাতুল বাকেয়া কেকা

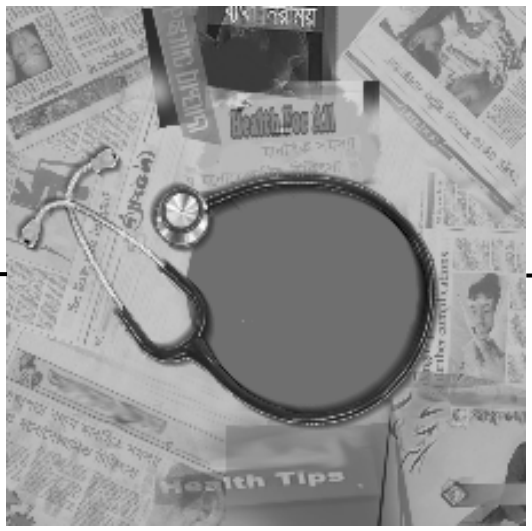

বিশ্বজুড়ে এখন জনপ্রিয় এক স্লোগান– চিনি এবং চিকিৎসক বর্জন করুন। কারণ আর কিছুই নয়, নিজেকে সুস্থ রেখে শরীর ও মনের বার্ধক্য প্রতিহত করা। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপের মতো অসংক্রমণ রোগ প্রতিহত করে রোগমুক্ত জীবন নিশ্চিত করা। যদিও মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থভাবে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে হালের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। পাশাপাশি অনলাইনের কারণে চিকিৎসাবিদ্যায় উন্নয়ন, নতুন আবিষ্কার, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার সহজলভ্যতা মানুষের এই বোধের জাগরণে অনেকটাই সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সংবাদ বা হেলথ রিপোর্টিংয়ের গুরুত্বও অনেকখানি। কারণ চিকিৎসা সম্পর্কিত নতুন অগ্রগতি, জটিল রোগমুক্তিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবদান– সহজ ভাষায়, মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলে ধরার কাজটি করছেন স্বাস্থ্য বিটের সাংবাদিকরা। বাংলাদেশের মতো জনবসতিপূর্ণ এবং মৌসুমি নানা রোগবালাইয়ের প্রকোপের মোকাবিলায় ব্যস্ততায় কাটে মানুষের বছরের অনেকটা সময়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সীমিত আয়ের মানুষের কাছে হাতের দোরগোড়ায় একজন চিকিৎসক এখন সহজলভ্য হলেও সেবার মান ও সেবাপ্রাপ্তির বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়াটা সবসময় সুখের হয় না। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার অন্যতম দায়িত্বই থাকে দেশের চিকিৎসা খাতের অগ্রগতি-উন্নয়ন, নিত্যনতুন গবেষণা, স্পর্শকাতর বিষয়ে চিকিৎসাসেবার উৎকর্ষতা, চিকিৎসার খরচ, সেবার মান-সুযোগ-সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি চিকিৎসকের সিদ্ধান্তে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও মতামত তুলে ধরাও। যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর ও টেকনিক্যাল বিষয়ে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের নিজেকে আগে দক্ষ এবং এই বিষয়ে পুরোপুরি জেনে-বুঝে পরিশীলিত করতে হয়। তাই স্বাস্থ্য বিটের সাংবাদিকরা সবসময় চেষ্টায় থাকেন নিজেকে আরও গতিময় ও উত্তরোত্তর জানাশোনার ধারাবাহিকতার লাইনে রেখে চলার। চিকিৎসা বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান করে কাজ করা কঠিন। একইভাবে চিকিৎসক ও চিকিৎসার ত্রুটি ঘটলে তা নিয়ে কাজ করাও সহজ নয়। তাই কোন বিষয়টি স্বাস্থ্য-সংবাদ হওয়ার যোগ্য, তা যেমন নির্ধারণ করতে হয়– একই সঙ্গে ওই রিপোর্ট জনগণকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সচেতন করবে না বিনোদন দেবে, সেটাও ভাবতে হয় তাকে। তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা পাহাড়সমান। তা ডিঙ্গিয়ে তবেই জনগণের কাছে পৌছে দিতে হয় সংবাদ আকারে। তাই স্বাস্থ্য-সংবাদের সংজ্ঞায়ন করাটাও ততটাই কঠিন।

সংবাদপত্র বা টেলিভিশন রিপোর্টিংয়ের লাইন-আপে প্রথম সারিতে স্বাস্থ্য সংবাদের স্থান ততটা হয় না। যতটা না রাজনৈতিক রিপোর্ট, মারামারি-অগ্নিকাণ্ড-হত্যা-খুন-গুমের সংবাদ স্থান পায়। গত দুই দশকে দেশে

একের পর এক ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু'র মতো সদ্যজানা ও অজানা রোগের প্রকোপ দেখা দেয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। প্রাণঘাতী রোগের বিস্তারের পর জীবন বড়ো অমূল্য ধন– এই বোধের তাড়নায় স্বাস্থ্য-সংবাদের গুরুত্ব খানিকটা বেড়েছে। তবে বিষয়টি যারা আমলে না নিয়ে অন্য সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে হেডলাইনে রেখেছেন, তাদের সবাই যে অনুধাবন করেননি তা নয়। গুটিকয়েক সংবাদপত্র-টেলিভিশন এবং সাংবাদিক তাদের নিরন্তর চেষ্টায় স্বাস্থ্য-সংবাদকে লাইম লাইটে আনার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন। এই ধারাবাহিকতায় নানা রোগবালাইয়ের প্রকোপ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ার পর তার ফলো-আপ রিপোর্ট হচ্ছে।

মূলত এই তিনটি ধারায় স্বাস্থ্য-সংবাদের গুরুত্ব এখন অনস্বীকার্য। কারণ স্বাস্থ্য-সংবাদ মানুষকে শুধু তথ্য-ধারণা দিয়ে সমৃদ্ধই করে না; রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে জনমানুষ, নাগরিক সমাজ, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান– এমনকি দায়িত্বশীলদের দায়িত্বহীনতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেমনটা ঘটেছে সম্প্রতি ডেঙ্গুজ্বরের বিস্তারকে কেন্দ্র করে। একটি প্রতিষ্ঠান বছরের শুরুতে আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছিল– এ বছর ডেঙ্গুর চারটি সেরোটাইপের অন্যতম ডেন-থ্রি দিয়ে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘটবে এবং রোগ জটিলতা বাড়বে। বাড়বে মৃত্যুহারও। আগাম বার্তা দিয়ে রোগ জটিলতা সম্পর্কে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত না করে সচেতন করাটাই ছিল মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি নানা উদ্যোগে এডিস মশার প্রজনন উৎস চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট মহলকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যও এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই স্বাস্থ্যঝুঁকির আগাম বার্তার গুরুত্ব গতানুগতিকভাবেই বোধগম্য হয়নি বা আমলে নেয়নি সংশ্লিষ্ট সব মহল। ফল হিসেবে এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও। ৩১ জুলাইয়ের প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩০ জুলাই পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫০ এবং ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩৫ জন।।

সম্প্রতি ডেঙ্গুর প্রকোপ নগরবাসীর পরিচ্ছন্নতার মাত্রা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, ইস্কাটনের মতো স্থান চিহ্নিত হয়েছে এডিস মশার উৎকৃষ্ট প্রজননস্থল হিসেবে। চলতি বছর জুলাইয়ে সর্বশেষ যে জরিপ চালানো হয় তাতে এই তথ্য মেলে। তবে মানুষের অভ্যাস ও আচরণগত অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে বলা যায় না। কারণ পরিসংখ্যান বলছে, যেখানে ব্লুটু ইনডেক্স বা এডিস মশার ঘনত্ব ২০ হলেই ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনের অঞ্চলবিশেষে এডিস মশার লার্ভা ব্লুটু ইনডেক্স ছিল ২৫০ বা ১২ গুণ বেশি। আর প্রাপ্তবয়স্ক মশার হারও ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ১২ থেকে ১৪ গুণ বেশি। শহরজুড়ে যেখানে-সেখানে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত টায়ারে লার্ভা পাওয়ার হার ২২ দশমিক ৯ শতাংশ, বিভিন্ন নির্মাণাধীন বাড়ির মেঝেতে জমানো পানিতে ১১ দশমিক ২৯ শতাংশ, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক ড্রামে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে পানির চৌবাচ্চায় ৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক গামলায় ৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ, মাটির পাত্রে ৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ, ফুলের টব ও ট্রেতে ৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ পরিত্যক্ত রঙের কোটায় ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ, টিনের পরিত্যক্ত পাত্রে ৩ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ লার্ভা পাওয়া গেছে। মূলত মানুষের অভ্যাসগত সমস্যা এবং যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা বর্জ্য এডিসের বংশবিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

চলতি বছরে ডেঙ্গুর প্রকোপ তুলে ধরে জনমানুষকে সচেতন করা এবং ডেঙ্গুতে প্রাণহানির ঘটনা কমাতে টেলিভিশন সাংবাদিকতা দারুণ ভূমিকা রেখেছে। গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। এভাবে টেলিভিশন সাংবাদিকতা সরাসরি স্পটভিত্তিক রিপোর্ট জনমানুষ ও কর্তৃপক্ষকে সচেতন ও ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরতে ভূমিকা রাখে।

চলতি বছরে ডেঙ্গুর প্রকোপ তুলে ধরে জনমানুষকে সচেতন করা এবং ডেঙ্গুতে প্রাণহানির ঘটনা কমাতে টেলিভিশন সাংবাদিকতা দারুণ ভূমিকা রেখেছে। গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। এভাবে টেলিভিশন সাংবাদিকতা সরাসরি স্পটভিত্তিক রিপোর্ট জনমানুষ ও কর্তৃপক্ষকে সচেতন ও ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরতে ভূমিকা রাখে

সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মানুষকে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য দিয়ে সচেতন করে থাকে। তুলে ধরে নাগরিকদের দায়িত্বও। সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করিয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত ও করণীয় সম্পর্কে তথ্য ও ধারণা পৌঁছে দেয় গণমাধ্যম। প্রতিরোধ ছাড়াও চিকিৎসাব্যবস্থায় নতুনত্ব ও জাতীয় গাইডলাইন মেনে চিকিৎসাব্যবস্থার অগ্রগতিও তুলে ধরেন সাংবাদিক। এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামতভিত্তিক 'টেলিপ্রেসক্রিপশন' বা 'ডাক্তার বাড়ি'– এরকম নানা নামে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও পরামর্শে নাগরিকদের জন্য তথ্য ও মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে টেলিভিশনগুলো। বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের পরিসংখ্যান ও জরিপের কাজ যখন সময়সাপেক্ষ এবং এ কাজে তেমন উদ্যোগ নেই, সেখানে টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো নিজ দায়িত্বে ডেঙ্গুতে সারা দেশের মৃত্যুর হিসাব রেখেছে।

সময়ের বিচারে টেলিভিশন মাধ্যম এখন তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যনির্ভর রিপোর্ট করে এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী ভূমিকা রাখছে। টেলিভিশন মানুষকে বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি তথ্য ও সেবার নিশ্চয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিলে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনসমূহ হাসপাতালকেন্দ্রিক স্পট রিপোর্ট বেশি করেছে। মূলত হাসপাতালে রোগীর ভিড়, চিকিৎসাসেবায় চিকিৎসকদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ, সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছে। পাশাপাশি হাসপাতালগুলো এ বছর ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসায় তাদের সেবার আওতা বাড়িয়ে আত্মনিবেদিত হয়ে কীভাবে চিকিৎসা করেছে, তা-ও তুলে ধরা হচ্ছে। এই সময়ে মানুষের মধ্যে ডেঙ্গুভীতি থেকে বেরিয়ে চিকিৎসাসেবার নিশ্চয়তার মাধ্যমে মৃত্যুহার কমাতে চ্যানেল আই-সহ বিভিন্ন টেলিভিশন জনসচেতনতামূলক ফিলার তৈরি করে তা নিয়মিত প্রচার করেছে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি তুলে ধরতে সম্প্রতি সংবাদের মধ্যেই আলাদা সিজি করে স্বাস্থ্য-সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। সেখানে প্রতিদিনই রাজধানীসহ সারা দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি তুলে ধরে সংবাদ প্রচার হচ্ছে।

সংবাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠানও করে থাকে চ্যানেলগুলো। চ্যানেল আই এর একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান 'টেলিপ্রেসক্রিপশন'। যেখানে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সরাসরি একজন দর্শক চিকিৎসকের কাছে প্রশ্ন করে তার সমস্যার

সমাধান পেতে পারেন। একটি প্রশ্নের মাধ্যমে একই ধরনের সমস্যা আক্রান্ত হাজারও মানুষ সমাধান পেয়ে থাকেন, যা এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। 'আপনার সুস্বাস্থ্য' নামে রেকর্ড করা আরেকটি টকশো চ্যানেল আইয়ে হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানটি আগে ধারণ করা হলেও অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিবসকেন্দ্রিক মাসে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানও থাকে। এর মধ্যে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস, মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, ক্যান্সার দিবসসহ নানা দিবসের আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা আসেন।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ৭১ টেলিভিশনে একাত্তর সকাল নামে একটি লাইভ টকশো হয়। সেখানেও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হয়ে কথা বলেন। বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টরা কথা বলেন। এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুগুলোর প্রাধান্য থাকে।

সময় টেলিভিশনের অনলাইনে প্রচারিত হয় স্বাস্থ্যবিষয়ক টকশো 'বদ্যি বাড়ি'। অনুষ্ঠানটিতে মূলত নতুন রোগের প্রতিকার ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষায়িত সেবার বিষয় তুলে ধরা হয়। প্রতিটি পর্বেই দেশের পাইওনিয়ার চিকিৎসকরা থাকেন। অনলাইনে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে দর্শকরা সরাসরি যুক্ত থাকেন। ফলে রোগীর চিকিৎসকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ থাকে। দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসকরা এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ এবং তা প্রতিকারে কথা বলেন। ৪৫ মিনিটের এই সরাসরি অনুষ্ঠানে কোনো বিজ্ঞাপন বিরতি নেই। ফলে বেশি মানুষ সরাসরি যুক্ত হয়ে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন। পেতে পারেন বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

সময় টেলিভিশনের ফেসবুকের সঙ্গে সংযুক্ত প্রায় ৫৪ লাখ দর্শক এবং ইউটিউবে ৩০ লাখ দর্শক ওই সব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন-উত্তর পর্ব দেখে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

চ্যানেল টোয়েন্টিফোরেও স্বাস্থ্যবিষয়ক টকশো প্রচারিত হয়। মুখোমুখি নামে একটি অনুষ্ঠান সপ্তাহে পাঁচ দিন সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে টকশো অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ক সাম্প্রতিক ইস্যুতে বিশেষজ্ঞরা মতামত ও পরামর্শ দেন। আবার 'হেলথ ক্লাস' নামে আরেকটি স্বাস্থ্যবিষয়ক টকশো রয়েছে চ্যানেল

টোয়েন্টিফোরে। ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

মানুষকে যে কোনো ইস্যুতে সচেতন হতে ঐক্যবদ্ধ করে টেলিভিশন রিপোর্ট। চলতি বছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি তুলে ধরে টেলিভিশন রিপোর্ট যে কোনো

জ্বরে আক্রান্তদের ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতন করেছে। মানুষ হাসপাতালমুখী হয়েছেন। সময়মতো জ্বরের ধরন শনাক্তে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য ছুটে গেছেন। ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে এডিস মশার প্রজনন স্থান ও উৎস সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। নিজ উদ্যোগে নিজ বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করেছেন। মশার কামড় থেকে নিজেকে সুরক্ষায় উদ্যোগী হয়ে নাগরিক দায়িত্ব পালন করে নিজের ও অন্যের জীবনকে করেছেন নিরাপদ। আর এখানেই স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদের সাফল্য। স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও সেবার বিষয়গুলো মানুষ প্রয়োজনে গুরুত্ব দেয় এবং নিজে উদ্বুদ্ধ হয় আর ১০ জনকে উদ্বুদ্ধ করে যে কোনো জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। স্বাস্থ্য-সংবাদের তাই তাৎক্ষণিক প্রভাব ছাড়াও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, যা মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জীবনের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এগিয়ে নেয়। একই সঙ্গে ওই তথ্যচাহিদার ভিত্তিতেই মানুষ বিনোদনও পায়। ব্যক্তিমানুষ এগিয়ে যায়, সমৃদ্ধ হয় প্রয়োজনীয় তথ্যজ্ঞানে। এখানেই টেলিভিশন রিপোর্টিংয়ের সফলতা।

লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, চ্যানেল আই

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

সাংবাদিকতার

সুযোগ

শিশির মোড়ল

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় পরিবর্তন দৃশ্যমান। দুই দশক আগে স্বাস্থ্য নিয়ে যে পরিমাণ সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ পেত, এখন তার চেয়ে বেশি সংবাদ প্রচারিত হয়। শুধু পরিমাণে নয়, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার মানেও পরিবর্তন এসেছে। অতীতে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা ছিল মূলত হাসপাতালকেন্দ্রিক। হাসপাতালে শয্যার সংকট, রোগীর দুর্ভোগ, অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে ছারপোকার উপদ্রব, হাসপাতাল থেকে আসামির পলায়ন, হাসপাতাল ভাঙচুর, ওষুধ চুরি, ভুল ওষুধ ব্যবহার– এসব নিয়েই সংবাদ ছাপা হতো। সাংবাদিকতা ছিল মূলত চিকিৎসাকে ঘিরে। সেই অবস্থা এখন আর নেই।

একটা সময় ছিল, যখন ভাবা হতো স্বাস্থ্য মানেই চিকিৎসার বিষয়। আর শুধু চিকিৎসকরাই এ বিষয়ে ভাবার, কথা বলার এখতিয়ার রাখেন। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটেছে। প্রয়োজনের চেয়ে কম হলেও এখন জনস্বাস্থ্য নিয়ে কথা, আলোচনা, বিতর্ক বেড়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইরে অন্য শাস্ত্রের ব্যক্তিও তাতে শামিল হয়েছেন। বৃহত্তর সমাজে স্বাস্থ্য নিয়ে জনসচেতনতা আগের চেয়ে বেড়েছে। চিকিৎসার বাইরে, হাসপাতালের বাইরে স্বাস্থ্য খাতে আর কী ঘটছে, সাধারণ মানুষ তা জানতে চায়। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের পক্ষে তাই এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ ছিল না। যা কিছু স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে তার সবকিছুতে গণমাধ্যম নজর দিতে চায়, দেওয়ার চেষ্টা করে।

গণমাধ্যমে এখন 'স্বাস্থ্য বিট' স্বীকৃত একটি বিট। দেশের প্রায় প্রতিটি বড়ো সংবাদপত্রে, সংবাদ এজেন্সিতে একজন নির্দিষ্ট প্রতিবেদক আছেন 'স্বাস্থ্য সংবাদ' কাভার করার জন্য। বেশ কয়েকটি টেলিভিশনেও স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দিষ্ট রিপোর্টার রয়েছেন। তারা প্রতিদিন দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কী ঘটছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে, চিকিৎসকদের সংগঠনগুলো কী করছে, এর খোঁজ রাখছেন। স্বাস্থ্যপুষ্টি নিয়ে প্রায় প্রতিদিন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচির আয়োজন করে, যা তারা নিয়মিত কাভার করেন। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয় বা স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছেন। বিশ্বের নামকরা জনস্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সাময়িকীতে নতুন বৈজ্ঞানিক বা গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে কি না, এর খোঁজ রাখছেন এবং বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হলে তা নিয়ে প্রতিবেদনও তৈরি করছেন।

স্বাস্থ্য যেহেতু একটি বিশেষায়িত বিষয় এবং এর সঙ্গে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয় জড়িত, তাই সব রিপোর্টার বা সাংবাদিকের পক্ষে স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি বুঝে ওঠা প্রাথমিকভাবে একটু কঠিন হয়ে ওঠে। তবে এই সমস্যা দূর করার প্রয়াসও দেখা গেছে। একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যের নানা দিক নিয়ে এই বিটের সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম এসব আয়োজনে বিশেষ সহায়তা দেয়। এতে সাংবাদিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা দুই-ই বেড়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক নতুন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়।

স্বাস্থ্যে নতুন বিষয়ের কোনো শেষ নেই। স্বাস্থ্য ভালো রাখার, অটুট রাখার চেষ্টা মানুষের অনাদিকালের। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেছে, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। মানুষ এখনো তুলসীপাতার রস খাচ্ছে, একই সঙ্গে ডিএনএ সম্পাদনার চেষ্টাও করছে। স্বাস্থ্য ভালো রাখার এই চেষ্টা মানুষ কখনো এককভাবে করে, কখনো গোষ্ঠীবদ্ধভাবে, কখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে, কখনো বৈশ্বিকভাবে করে। এসব চেষ্টা, উদ্ভাবন, উদ্যোগ নিয়ে নানা বিতর্কও হয়েছে। যেমন– এখন একটি বিতর্ক চলছে ব্যবহার উপযোগী তৈরি চিকিৎসা-খাদ্য বা আরইউটিএফ (রেডি টু ইউজ থেরাপিউটিক ফুড) নিয়ে। মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির (সিভিয়ার অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন বা স্যাম) শিকার শিশুর চিকিৎসায় রোহিঙ্গা শিবিরগুলোয় আরইউটিএফ ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের একাধিক শীর্ষ পুষ্টিবিদ ও শিশুচিকিৎসক কাজটি ঠিক হচ্ছে না বলে মত দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, ফিতাকৃমির সংক্রমণের বড়ো ধরনের উদ্যোগ ছিল আফ্রিকায়। এটাই পরবর্তী সময়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি তৈরি করে। খ্রিষ্টান মিশনের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু অঞ্চলে কেন্দ্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যায়। তখন ইউরোপের দেশগুলোয় পরিবেশ সুরক্ষা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে জনস্বাস্থ্যের বিষয় বলে ভাবা হতো। ফরাসি উপনিবেশগুলোয় মহামারি প্রতিরোধে জোর দেওয়া হয়েছিল। ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রসূতি সেবার উন্নতিতে কমিউনিটির ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

বৈশ্বিক বড়ো উদ্যোগ ছিল ১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে গত শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন দেশে রোগ প্রতিরোধ উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ রোগের প্রকোপ কমানোর বা রোগ নির্মূল করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হতে থাকে। প্রচারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গুটিবসন্তের জীবাণু এখন গবেষণাগারে। মানুষ থেকে মানুষে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়ার সর্বশেষ ঘটনা ঘটে ১৯৭৭ সালে। রোগ প্রতিরোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) চালু হয় ১৯৭৪ সাল থেকে (বাংলাদেশে ১৯৭৯ সাল)। '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'– এই বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমাআটাতে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

আজও বিশ্বের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়নি। তবে নিশ্চিত করার চেষ্টাও থেমে নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বিকল্প, নতুন পথের সন্ধান করছে বিশ্বসম্প্রদায়। তারই ধারাবাহিকতায় এসেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ) ধারণা। এই ধারণাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রভাগে আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) এই ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

আজও বিশ্বের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়নি। তবে নিশ্চিত করার চেষ্টাও থেমে নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বিকল্প, নতুন পথের সন্ধান করছে বিশ্বসম্প্রদায়। তারই ধারাবাহিকতায় এসেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ) ধারণা। এই ধারণাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রভাগে আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) এই ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অর্থ–

১. প্রতিটি মানুষ উন্নতিসহায়ক, প্রতিরোধমূলক, আরোগ্যলাভকারী ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবা পাবে।
২. এই সেবা হবে মানসম্পন্ন এবং মানুষ সেই মানসম্পন্ন সেবা পাবে তার প্রয়োজনের মুহূর্তে।
৩. সেবা পাওয়ার জন্য মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে।
৪. অর্থের অভাবে মানুষ সেবাবঞ্চিত হবে না, সেবা নেওয়া থেকে বিরত থাকবে না এবং সেবার খরচ মেটাতে গিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়বে না। অর্থাৎ সেবা হবে আর্থিক ঝুঁকিমুক্ত।

স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক সভা ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোয় কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনেকে মনে করেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল ফোকাস স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের ওপর। ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল: 'হেলথ সিস্টেমস ফাইন্যান্সিং: দ্য পাথ টু ইউনিভার্সাল কাভারেজ'।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই এ বিষয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় (সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই কার্যকর অর্থায়ন, প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১১)। এরপর বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেয় রকেফেলার ফাউন্ডেশন। রকেফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে সাংবাদিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। ওই প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু প্রশিক্ষণ হয়েছিল। সাংবাদিকদের ব্যবহারের জন্য 'স্বাস্থ্য সন্ধান' নামে গণমাধ্যম সহায়িকাও প্রকাশ করে পিআইবি।

পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা করে। তাতে অর্থায়ন করেছিল ইউএসএআইডি। এরকম উদ্যোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিটেরও আছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদনের সংখ্যা ও মান বাড়ানো। কাজের সুবিধার্থে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে:

১. স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য: বর্তমান পরিস্থিতি কী, একজন সাংবাদিক কী চোখে দেখেন?
২. সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৌশল বা পদ্ধতি: এর সঙ্গে স্বাস্থ্যবিমার কী সম্পর্ক রয়েছে, প্রতিবেদন করার সুযোগ আছে কি?
৩. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন: অর্থায়ন কীভাবে হয়, সাংবাদিকের অনুসন্ধান করার কী আছে?

প্রতিটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। আলোচনার ভিত্তিতে নতুন প্রতিবেদনের ধারণা বের করাই এই অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য।

১. স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য

সিয়েরা লিওনে আজ যে শিশুটি জন্ম নিল, তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৪৬ বছর, এটাই তার প্রত্যাশিত গড় আয়ু। আর জাপানে জন্ম নিল যে শিশু, তার পৃথিবীতে বসবাসের সম্ভাবনা ৮৪ বছর। জন্মের দিনেই ঠিক হলো যে, পৃথিবীর এক প্রান্তে জন্ম নেওয়া শিশু অন্য প্রান্তের জন্ম নেওয়া শিশুটির চেয়ে ৩৮ বছর কম বাঁচবে। প্রায় একজীবনের পার্থক্য। একই সময়ে একই পৃথিবীতে খারাপ ও ভালোর সহাবস্থান। (মাইকেল মারমোট, দ্য হেলথ গ্যাপ, ২০১৫)

স্বাস্থ্যে এই বৈষম্য শুধু ধনী আর দরিদ্র দেশের মধ্যে নয়। একটি দেশের অভ্যন্তরেও এই বৈষম্য দেখা যায়। স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। এই দেশে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের স্বাস্থ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মাদকাসক্তি, হৃদরোগ, স্থূলতা বেশি।

শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, এই বৈষম্য বা পার্থক্য বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে ধনিক শ্রেণির পাঁচ বছরের কম বয়সি ২৬ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম (স্টানটেড)। সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে এই হার প্রায় দ্বিগুণ, ৫৪ শতাংশ। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ধনিক শ্রেণিতে ৪৩ আর দরিদ্র শ্রেণিতে ৮৫।

বাংলাদেশে প্রসব-পূর্ববর্তী চারবার প্রসূতি সেবা পায় দরিদ্র পরিবারের ৭ শতাংশ গর্ভবতী, ধনিক শ্রেণির মধ্যে এই হার ৪৭ শতাংশ। প্রসবকালে দক্ষ প্রসবকর্মীর সহায়তা ধনিক শ্রেণির প্রসূতিরা বেশি পায়। অন্যদিকে প্রসবকালে গ্রামের প্রসূতিরা শহরের প্রসূতিদের তুলনায় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা কম পায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। শিক্ষিত মায়েরা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষর মায়েদের চেয়ে এগিয়ে। শিক্ষিত মায়েদের মধ্যে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশি। মা নিরক্ষর হলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর। নিরক্ষর মায়েদের শিশু কম টিকা পায়, নিরক্ষর মায়েদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার বেশি।

স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের হিসাব অনুযায়ী, মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৪৬ শতাংশ ব্যয় হয় ঢাকা বিভাগে। সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ব্যয় হয় ৪ শতাংশ করে। ধারণা হতে পারে ঢাকায় মানুষ বেশি তাই মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ও বেশি। কিন্তু হিসাবের আরও একটু গভীরে গেলে বৈষম্য ধরা পড়ে। ঢাকা বিভাগে মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ৩ হাজার ৮৫৬ টাকা। দেশে এটাই সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু ব্যয় সবচেয়ে কম রংপুর বিভাগে। এই বিভাগে মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য ব্যয় ১ হাজার ৫০৩ টাকা।

এই তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়। শিক্ষা, পেশা, পরিবারের আয়, অবস্থান, জেন্ডার– এসব সামাজিক বিষয় (সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস) বৈষম্য তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– বৈষম্য কেন হয়? বৈষম্য কি কেউ তৈরি করে, নাকি বৈষম্য আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়। সরকার সব উপজেলায় একটি করে উপজেলা হাসপাতাল তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে সরকার কোনো বৈষম্য করেনি। কিন্তু রাজধানীর পাশের সাভার উপজেলার যে কোনো প্রান্তের রোগীর পক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো সহজ, সেবা পেতে কষ্ট হয় না। অন্যদিকে হাওড় এলাকার বা তিস্তাপারের মানুষকে অনেক কষ্টে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। তাই এদের মধ্যে সেবা গ্রহণের হার কম, স্বাস্থ্য সূচকে এরা পিছিয়ে। প্রবেশগম্যতা এখানে বৈষম্য তৈরি করেছে।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারণা মূলত কতগুলো মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত: ন্যায্যতা (Equity), সংহতি বা ঐক্য (Solidarity), সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice)– এগুলো অন্যতম

বরিশাল বিভাগে চিকিৎসকের শূন্যপদ সবচেয়ে বেশি। এর অর্থ– কর্মস্থলে উপস্থিত চিকিৎসকের ওপর রোগীর চাপও বেশি। তুলনামূলকভাবে রোগী কম থাকায় ঢাকার কাছে যে কোনো উপজেলায় একজন চিকিৎসক যে মানের সেবা দিতে পারেন, বরিশাল বা ভোলার উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেটা সম্ভব হয় না। সেবার মান এখানে বৈষম্য তৈরি করেছে। সেবার মানে এই বৈষম্য হয়েছে ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে।

বৈষম্যের তালিকা দীর্ঘ করার পাশাপাশি এ নিয়ে আলোচনা প্রলম্বিত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য হচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য নিয়ে রিপোর্ট করার সুযোগ আছে। বেশি রিপোর্ট হলে বৈষম্য দূর হওয়ারও সম্ভাবনা বাড়বে।

২. সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৌশল বা পদ্ধতি

প্রতিবেশী অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো না খারাপ থাকবে। ব্যক্তি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে না। সবার স্বাস্থ্য ভালো রাখার মধ্য দিয়েই ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা অনেক। সমাজ যত বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হবে, ব্যক্তি তত উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। সমাজ যেহেতু ব্যক্তির সমষ্টি, তাই সব ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো রাখার মধ্য দিয়ে সমাজ সুস্থ থাকবে– সাদামাটাভাবে এটাই সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূলকথা।

আমরা যদি পাড়া-প্রতিবেশীর দিকে তাকাই, তাহলে সমাজের এই ভূমিকা দেখতে পাই। প্রসূতিকে জরুরি চিকিৎসার জন্য গ্রামের মানুষ এখনো নৌকা দিয়ে, জনবল দিয়ে সহায়তা করে। আবার জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন। এর পেছনে কাজ করে মূল্যবোধ।

এই মূল্যবোধই তৈরি করে সামাজিক পুঁজি বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল। সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আলোচনায় স্থান পায় না। এর সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক কম।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারণা মূলত কতগুলো মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত: ন্যায্যতা (Equity), সংহতি বা ঐক্য (Solidarity), সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice)– এগুলো অন্যতম। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আলোচনায় ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে চিকিৎসার খরচ কীভাবে মিটবে বা অর্থায়ন কীভাবে হবে এবং ব্যক্তি কী কী সুযোগ-সুবিধা (বেনিফিট প্যাকেজ) পাবে, সেটাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল বক্তব্য হচ্ছে, রোগগ্রস্ততার ঝুঁকি সবার আছে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় সমাজের সবাই এগিয়ে আসবে, তৈরি করবে একটি তহবিল। যার চিকিৎসা দরকার হবে, সে ওই তহবিলের সহায়তা পাবে। অর্থ দেবে সবাই, কিন্তু সহায়তা পাবে যার দরকার শুধু সে-ই।

সহায়তার নানা ধরন

ট্যাক্স বা কর: মানুষ সরকারকে ট্যাক্স বা কর দেয়, সেই ট্যাক্সের টাকা সরকার স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করে বা করতে পারে। ব্যক্তির আয়, সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, করপোরেট লাভ– এসবের ওপর সরকার নির্দিষ্ট কর ধার্য ও গ্রহণ করে। এগুলো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কর। আবার কিছু পরোক্ষ করও আছে। পণ্য বা সেবা পেতে গেলে ব্যক্তিকে তা পরিশোধ করতে হয়। যেমন– পাপ কর বা সিন ট্যাক্স। অনেক দেশে সিগারেট, বিড়ি বা অন্য তামাকজাতীয়

পণ্যের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স প্রযোজ্য। ফিলিপাইনে সিন ট্যাক্সের ৮০ শতাংশ দেওয়া হয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবায়। দুই ধরনের ট্যাক্সের বাইরে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বার্ষিক বরাদ্দ থাকে।

এর বাইরে সরকার গর্ভবতী নারী বা কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ বরাদ্দ করতে পারে। জাতীয় কোনো স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি থাকলে সেখানে বার্ষিক বরাদ্দ বা শ্রেণিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে পারে।

বেতন পেলেই স্বাস্থ্য করঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিমাসের বেতন থেকে বেতনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চিকিৎসায় ব্যয় করার জন্য কেটে রাখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা রোগের ঝুঁকিতে আছেন– এই বিবেচনা থেকে তাদের বেতন কাটা হয় না, কাটা অংশটা জমানো হয় ভবিষ্যতে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার খরচ মেটাতে। জমা যা-ই হোক, তহবিল থেকে একবারে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পেতে পারেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। বাংলাদেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে।

ফিলিপাইনে এটি আইন করে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত বেতন পান তাদের স্বাস্থ্য কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। করের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বেতনের ওপর। এই কর পরিশোধ করেন চাকরিদাতা। কোনো ড্রাইভার যদি নিয়মিত বেতন পান, তাহলে তার স্বাস্থ্য করও পরিশোধ করতে হয় ওই ড্রাইভার যার গাড়ি চালান তাকে। তবে অসুস্থ হলে গাড়ির মালিক ও ড্রাইভার একই মানের সেবা পান।

বিমা ব্যবস্থাঃ প্রতিমাসে বা বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি তহবিলে জমা হয় এবং শর্ত অনুযায়ী সেই অর্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় বা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যয় করা হয়। প্রতিমাসের বা বছরের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ (প্রিমিয়াম) কত হবে, তহবিল ব্যবস্থাপনা কে করবে, বেনিফিট প্যাকেজে কী থাকবে– এসবই চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন বা ব্যবসায়িক কোম্পানি এর ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারে। বাংলাদেশে সবার জন্য এই বিমা ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না, তা নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে।

এই তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কী হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করার সুযোগ আছে। সাংবাদিকরা চাইলে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করতে পারেন।

৩. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন

সর্বশেষ হিসাব বলছে, দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য ব্যয় ৩৭ ডলার বা ২ হাজার ৮৮২ টাকা।

স্বাস্থ্য ব্যয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ আসে মানুষের পকেট থেকে। মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ মানুষ নিজে খরচ করে। সরকার মোট খরচের ২৩ শতাংশ বহন করে। সরকারের এই খরচের মধ্যে আছে উন্নয়ন প্রকল্প এবং নিয়মিত বার্ষিক খরচ (বেতনভাতা ইত্যাদি)। উন্নয়ন সহযোগী ও দাতাদের অর্থের পরিমাণ ৭ শতাংশ। আর দাতব্য প্রতিষ্ঠানসহ এনজিওগুলোর অবদান ৩ শতাংশ।

হিসাব বলছে, স্বাস্থ্যের জন্য মানুষ নিজের পকেট থেকেই বেশি খরচ করে। মাথাপিছুর হিসাবের মধ্যে কিছু সত্য লুকানো অবস্থায় আছে। ধনী ব্যক্তি সামান্য অসুখে পাঁচতারা হাসপাতালে সেবা নেন, তার বার্ষিক খরচ অনেক বেশি। আর দরিদ্র যে, সে সামান্যই খরচ করে। সবচেয়ে ধনিক ও দরিদ্র শ্রেণির হিসাব পাওয়া গেলে বোঝা যাবে আসলেই দরিদ্র মানুষ কত খরচ করে বা করতে পারে।

মানুষ এই টাকা পায় কোথা থেকে। মানুষ নিজের উপার্জন থেকে ব্যয় করে। যার উপার্জন নেই, সে সম্পত্তি বিক্রি করে বা ধারদেনা করে। এই ধারদেনা বা সম্পত্তি বিক্রি করে চিকিৎসার আকস্মিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। দারিদ্র্য স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে আসা মানুষ নতুন সমস্যায় পড়ে।

সরকার দুইভাবে স্বাস্থ্য খাতে অর্থ খরচ করে। একটি রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে। এতে মূলত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা নিশ্চিত করা হয় এবং গতানুগতিকভাবে প্রতিবছর এই বাজেট বাড়ে। অন্যটি উন্নয়ন বাজেট। এটি এখন হচ্ছে মূলত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনায় (অপারেশন প্ল্যানে) সরকার অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। এসব কর্মপরিকল্পনায় দাতা সংস্থারও অর্থ আছে।

দাতারা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ দেয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নেও অর্থ দেয়। বাকি অংশটা আসে এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে।

কোথায় খরচ হয়

মানুষ বেশি খরচ করে ওষুধের পেছনে। চিকিৎসা খাতে ব্যক্তির মাথাপিছু যে ব্যয়, তার ৭০ শতাংশ চলে যায় ওষুধ কিনতে। হাসপাতাল বা ক্লিনিক থেকে নিরাময়মূলক সেবা পেতে ১১.৫ শতাংশ খরচ হয়। হাসপাতালের বহির্বিভাগে খরচ করে ১০ শতাংশ। ৮.২ শতাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খরচ হয়। অন্যান্য খাতে দশমিক ৮ শতাংশ।

প্রমাণ বা সফল উদাহরণভিত্তিক সিদ্ধান্ত

স্বাস্থ্যে অর্থায়ন জটিল প্রক্রিয়া এবং অগ্রাধিকার ঠিক করা কঠিন। ২০ কোটি টাকার যন্ত্র কেনা জরুরি না টিকা দেওয়া জরুরি। জনবল বাড়ানো দরকার, না হাসপাতাল ভবন নির্মাণ দরকার– কোনটা আগে? সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগের আগে দেখতে হবে দেশে বা বিদেশে এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ কী আছে।

সরকার কী করছে

সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলছে। পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচির দলিলে এই নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এর আগে হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট ২০ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র (২০১২-২০৩২) তৈরি করেছিল। সেই কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

ওই কৌশলপত্রে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের বেশকিছু চ্যালেঞ্জের উল্লেখ আছে। সেগুলো হচ্ছে:

১. স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের স্বল্পতা।
২. স্বাস্থ্যসেবায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারে অন্যায্যতা।
৩. বরাদ্দকৃত সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা।

ওই দলিলে পকেট থেকে নগদ ব্যয় (Out of Pocket Expenditure) কমানোর লক্ষ্যে তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল:

১. কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার জন্য আরও সম্পদের ব্যবস্থা করা।
২. স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্যতা জোরদার করা এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা বাড়ানো।
৩. সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি।

এই কৌশলপত্র তৈরির সময় পকেট থেকে নগদ ব্যয় ছিল ৬৩ শতাংশ। আর এখন তা বেড়ে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উলটো কেন হলো, এর পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিমা চালু করার একটি দিশারি প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা এই কৌশলপত্রে উল্লেখ আছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি নামের ওই দিশারি প্রকল্প ২০১৬ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে টাঙ্গাইলের তিনটি উপজেলায় দিশারি প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। এখনো তা শেষ হয়নি।

শেষের গল্প

সদরঘাটেই বেড়ে উঠেছিলেন ভোলার তসলিম মিয়া। মুটেগিরি করে বেড়ে ওঠা। বিয়ে। ছেলে ক্লাস এইট, মেয়ে কলেজে। কলার খোসায় পা পিছলে যায় সুঠামদেহী তসলিমের। মেরুদণ্ডে আঘাত। আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে প্রথমে মেয়ের, পরে ছেলের পড়ালেখা বন্ধ। পরিবারটি নিঃস্ব।

যদি মুটেদের সংগঠন তসলিমের পাশে দাঁড়াত, যদি স্বাস্থ্যবিমা থাকত, যদি তসলিমের চিকিৎসায় পরিবারকে কোনো খরচ করতে না হতো, তাহলে গল্পের শেষটা অন্যরকম হতে পারত। সেই অন্যরকম গল্প লেখার কথাই বলে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, প্রথম আলো

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার খসড়া আলোচনা

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শিবলী নোমান

সাংবাদিকতা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি, তখন সাধারণত আমাদের মাথায় থাকে প্রথাগত সাংবাদিকতা। তবে 'প্রথাগত সাংবাদিকতা' শব্দবন্ধটিও এক্ষেত্রে যথাযথ কি না, তা নিয়ে আলাদা বিতর্ক হতে পারে। কারণ প্রথা দেশ থেকে দেশে কিংবা সমাজ থেকে সমাজে পরিবর্তিত হয়। তাই তথাকথিত 'প্রথাগত সাংবাদিকতায়' আসলে কোন কোন বিটের সাংবাদিকতা স্থান পাবে, তা স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। তারপরও মোটাদাগে বলতে হলে বলা যেতে পারে, নিয়মিত যেসব ক্ষেত্রের সাংবাদিকতা নিয়ে সংবাদকর্মী ও মিডিয়া হাউসগুলো ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে পাঠক-শ্রোতা-দর্শক তথা অডিয়েন্স যে ধরনের সাংবাদিকতা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখে থাকে, ভিন্নভাবে বলতে চাইলে যে ধরনের সাংবাদিকতা অডিয়েন্স দেখতে চায় এবং এর ফলে মিডিয়া হাউসগুলো যেসব বিটে নিয়মিত সাংবাদিকতা করে থাকে, তা-ই হলো প্রথাগত কিংবা প্রচলিত সাংবাদিকতা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেসব বিট এ ধরনের সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে, তার সঙ্গে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের খুব বেশি অমিল আছে বলা যাবে না। মূলত রাজনীতি, সংঘাত, অনিয়ম, ভোগান্তি, খেলাধুলা এবং কখনো কখনো বিনোদন বিটেই আমাদের প্রচলিত সাংবাদিকতা ঘুরপাক খায়। অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিট যেমন আমাদের দেশে অনেকটাই একঘরে বা বিশেষ অডিয়েন্সের জন্য, তেমনি কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিট রয়েছে অনেকটাই অবহেলিত। এরকম একটি অবস্থানে থেকে সাংবাদিকতার আরেকটি ক্ষেত্র, যা আমাদের দেশে বেশ অপরিচিতই বলা যায়, আবার এর চেয়ে ব্যাপক অর্থে অপ্রচলিতও বলা যায়, তেমন একটি ক্ষেত্র স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি খসড়া আলোচনাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

উন্নত, উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত– একটি দেশ যেমনই হোক না কেন, সব দেশের সরকারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি। বিশ্বজিত ঘোষ ও তার দলের ২০১৬ সালের একটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বর্তমান সময়ে জনস্বাস্থ্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক আর কোনো বিষয় নেই। উপরন্তু জনস্বাস্থ্য বিশ্বায়নকে যেভাবে প্রভাবিত করে বা করছে, অন্য কোনো বিষয় এভাবে বিশ্বায়নকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সোয়াইন ফ্লু, জিকা ভাইরাস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি বিষয়াদির বিভিন্ন সময় দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় পরিণত হওয়া গবেষকদের এই বক্তব্যকেই দৃঢ় ভিত্তি দেয়।

আর ঠিক এই অবস্থান থেকেই স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা কী?

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (USAID) সহায়তায় একটি প্রকল্প রয়েছে, যা নলেজ ফর হেলথ (K4Health) নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের অধীন ২০১৩ সালে একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল– Writing About Health: A Handbook for Journalists in Bangladesh।

এই হ্যান্ডবুকের তথ্যানুযায়ী, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা হলো সাংবাদিকতার সেই শাখা, যেখানে স্বাস্থ্য সংকটে কিংবা কোনো ধরনের সংকটহীন সময়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ইস্যু বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে সাধারণ নাগরিকদের সহায়তা করা হয়। কীভাবে আরও বেশি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা যায় এবং যে কোনো সংকটকালীন কীভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সংকট নিরসন করা যায়, তা নিয়েই সাধারণত এ ধরনের সাংবাদিকতা কাজ করে থাকে। তবে এ ধরনের সাংবাদিকতা অনেক সময় সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিমানুষকে উদ্দেশ করেও হতে পারে, যার মূল লক্ষ্য থাকে ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষের স্বাস্থ্যোন্নয়নে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়, যা অনেকটাই প্রথাগত সাংবাদিকতার সঙ্গে মিলে যায়। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো–

* যথার্থতা
* সহজবোধ্যতা (জার্গনের স্থলে ব্যাখ্যা দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় জার্গন ব্যবহার না করা)
* ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য প্রদান
* ধারাবাহিকতা
* প্রাসঙ্গিকতা
* সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভরতা

বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুগুলোর মধ্যে গর্ভকালীন মৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু, পুষ্টিহীনতার মতো ক্ষেত্রগুলোয় সাম্প্রতিক সময়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া দেশের মানুষের গড় আয়ু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈশ্বিক গড় আয়ুর চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে

একই সঙ্গে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নৈতিক প্রশ্নের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, যার উত্তর একজন স্বাস্থ্য বিটের সাংবাদিককে দিতে হয়। মূলত একজন সাংবাদিক একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টিং করার আগে নিজেকে এসব প্রশ্ন করবেন এবং এসব প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করবেন। প্রশ্নগুলো হলো–

* এই তথ্য প্রকাশ করার ফলে ইতিবাচক কী ঘটবে?
* কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে?
* প্রাপ্ত তথ্য কি সত্য?
* সাংবাদিক কি তথ্যের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র প্রকাশ করতে সক্ষম?
* তথ্যটির প্রকাশ কি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো ধরনের সুবিধা প্রদান করবে?
* বিবেচনার জন্য কোনো বিকল্প পন্থা আছে কি?

এছাড়া পাঠক বা দর্শকের চাহিদা মাথায় রেখে সে অনুযায়ী আধেয় তৈরি করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একই সঙ্গে সরকারি নীতিমালার সঙ্গে বাস্তবতার তুলনা, নীতিমালাগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রভাব নিয়ে আলোচনাও স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার অন্তর্গত বিষয় হতে পারে।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাংবাদিকতার স্বরূপ

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করতে হলে সবার আগে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু স্বাস্থ্য বিটের সাংবাদিক জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করবেন তাই এর কোনো বিকল্প নেই। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩তম সার্জন জেনারেল সি. এভারেট কুপ বলেন, 'Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time.' অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, বরং সর্বদা, সব স্থানে বর্তমান একটি ইস্যু। আবার উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের অংশীজনদের ভেতর তথ্যের চলাচল ও যোগাযোগ তৈরির বিষয়ে আলোকপাত করেন বিশ্বজিত ঘোষ ও তার দল।

জনস্বাস্থ্য নিয়ে সাংবাদিক যখন কাজ করেন, তখন সাধারণত এমন সব স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যু নিয়ে কাজ করতে চান, যেখানে সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। অর্থাৎ একটি স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেওয়ার পরই সাধারণত এই বিটের সাংবাদিক তা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তবে অনেক সময় মিডিয়া হাউসের নেতিবাচক ভূমিকাও স্বাস্থ্য বিটকে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় মনে না করার একটি কারণ।

এদিকে বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুগুলোর মধ্যে গর্ভকালীন মৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু, পুষ্টিহীনতার মতো ক্ষেত্রগুলোয় সাম্প্রতিক সময়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া দেশের মানুষের গড় আয়ু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈশ্বিক গড় আয়ুর চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। তারপরও উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতেই হচ্ছে। এছাড়া হৃদরোগজনিত জটিলতা, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যায় আক্রান্তের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। ডেঙ্গু, ডায়রিয়া চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ অনেক সময় মহামারি আকার ধারণ করছে। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাব, এইচআইভি/এইডস, অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক বিষয়েও এখনো অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ রয়ে গেছে। এসব বিষয়ে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ধরন নিতান্তই সাধারণ বলতে হয়। কারণ কোনো ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা না দিলে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু না হলে কোনোভাবেই এসব বিষয়ে গণমাধ্যমকে যুক্ত করা যাচ্ছে না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোনো একটি স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেওয়ার আগেই অর্থাৎ সামনে আসার আগেই যদি তা প্রতিরোধে ভূমিকা নেওয়া যায়, তাহলে এর মাধ্যমে পুরো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। অন্যদিকে ঝুঁকি হ্রাসকরণে এভাবে ভূমিকা রাখতে পারলে তা অসুস্থতা, ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসায় অনেক বেশি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে সংকটকালীন জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সাংবাদিকতা না করে যদি একে একটি নিয়মিত বিটে পরিণত করা যায়, তাহলে এর সুফল রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিটে কাজ করা সাংবাদিকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, সেই প্রসঙ্গে Writing about health হ্যান্ডবুকে বলা হয়েছে–

* কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিতকরণে নাগরিকদের স্বাস্থ্যাবস্থা পর্যবেক্ষণ
* তদন্তপূর্বক কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন
* স্বাস্থ্য ইস্যুতে নাগরিকদের তথ্য সরবরাহ, শিক্ষাদান ও ক্ষমতায়ন
* স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণে কমিউনিটিভিত্তিক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে জোর দেওয়া
* পলিসি তৈরিতে ভূমিকা রাখা
* স্বাস্থ্যবিষয়ক বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা কার্যকরে ভূমিকা রাখা
* বিদ্যমান নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা বা অনুরূপ প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রয়োগযোগ্যতা ও মান পরীক্ষণ

ইরান: স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার কেস স্টাডি

এত আলোচনার পরও বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার স্বরূপ কিংবা বাস্তবতা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কারণ এ বিষয়ে যথাযথ গবেষণা খুব বেশি দেখা যায় না। আবার এই মুহূর্তে দেশে যে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় গুরুত্ব দেওয়া গণমাধ্যম একেবারেই নেই, তা-ও বলা যায় না। স্বল্পপরিসরে কিছু কাজ নিয়মিতভাবেই হচ্ছে। শুধু স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করে এমন অনলাইন পোর্টালও এ মুহূর্তে দেশে আছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রথাগত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহ বিষয়ে ধারণালাভ করতে কেস স্টাডি হিসেবে ইরানের একটি গবেষণার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। মাহরোখ কেশভারি ও তার দলের ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধে ইরানের ইস্ফাহান শহরের সাংবাদিকদের তথ্য প্রকাশিত হয়। গবেষণায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের ৫৬ শতাংশ ছিলেন নারী এবং ৪৪ শতাংশ পুরুষ। দেখা গেছে, এই সাংবাদিকদের ৬৫ শতাংশের স্বাস্থ্য রিপোর্টিং বিষয়ে কোনো বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নেই। আরও দেখা গেছে, ৩৫ শতাংশ সাংবাদিক স্বাস্থ্য ইস্যুগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারেন না। স্বাস্থ্যবিষয়ক টার্মগুলো সম্পর্কে ৫৯ শতাংশ সাংবাদিকের জ্ঞান মাঝারি থেকে নিম্নপর্যায়ের। এই সাংবাদিকদের ৮৮ শতাংশ স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা বলতে চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা রিপোর্ট থেকে সংবাদ করাকেই বুঝে থাকেন।

এই গবেষণা প্রবন্ধের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথাগত সাংবাদিকদের ধারণা একদমই অস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে যথাযথ প্রাথমিক জ্ঞানও তাদের নেই। এক্ষেত্রে ইরান একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তাদের সাংবাদিকদের নিয়ে করা এই গবেষণা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থা কী, তা নিয়ে ভেবে না দেখার কোনো অবকাশ নেই। তবে আশার কথা হলো, ইরানের এ গবেষণার ফলাফলে এটিও দেখা যাচ্ছে যে, ৯৭ শতাংশ সাংবাদিক পেশাগত চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। অর্থাৎ সাংবাদিকদের যথাযথ লজিস্টিক সহায়তা সরবরাহ করতে পারলে এই বিটকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

গবেষণা প্রবন্ধের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথাগত সাংবাদিকদের ধারণা একদমই অস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে যথাযথ প্রাথমিক জ্ঞানও তাদের নেই

কার্যকর স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার উপাদান

বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা একটি অনিবার্য বিষয়। এ বিষয়টি আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব, ততই ভালো হবে। এক্ষেত্রে কার্যকর স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার উপাদানগুলো জানা থাকা জরুরি। হ্যারি ডাগমোর আফ্রিকায় স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার গুরুত্ব বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধে কার্যকর স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার পাঁচটি উপাদানের উল্লেখ করেন, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এগুলো হলো:

* **সত্যবাদিতা (Veracity):** সাংবাদিকতায় এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় সত্যবাদিতা থাকতে হয় ভিন্নমাত্রায়। তথ্য যাচাই-বাছাই, বিশ্বাসযোগ্যতা ও যথার্থতা এক্ষেত্রে খুব বড়ো প্রশ্ন হিসেবে সামনে উঠে আসে।
* **স্বচ্ছতা (Transparency) :** স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় স্বচ্ছতার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ বিভিন্ন দেশে এইচআইভি/এইডসের মতো ট্যাবু বিদ্যমান এবং এর সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রতারকগোষ্ঠী আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে থাকে। অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠান চিকিৎসক ও সাংবাদিককে অনৈতিক সুবিধা, বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থার মতো অবৈধ সুবিধা দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে চায়। ২০০৯ সালে মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজারকে (Pfizer) ২.৩ বিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয় চিকিৎসক ও সাংবাদিককে ঘুস দেওয়ার দায়ে। এটি ছিল সে সময় পর্যন্ত এ ধরনের অপরাধে সবচেয়ে বড়ো অঙ্কের জরিমানা এবং শুনানি চলাকালীন মামলার প্রসিকিউটর উল্লেখ করেন, নিজেদের পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করতে মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর এমন আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **সামগ্রিকতা (Inclusivity):** প্রচলিত স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা হয়ে থাকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন। এগুলো নিয়মিত আধেয় হিসেবে গণমাধ্যমে উঠে আসে না। অন্যদিকে আরও একটি সমস্যা হলো আমাদের দেশের পুরুষ সাধারণত বিভিন্ন রোগ বা স্বাস্থ্য বিষয়ে কম সচেতন হয়ে থাকেন। ফলে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার আধেয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এই স্ট্যাটাসকে ভেঙে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা করতে হবে।
* **যুক্ত থাকা (Engagement):** আমাদের দেশে সাধারণত দিনের ঘটনা নিয়েই বেশি সংবাদ ও সাংবাদিকতা হয়ে থাকে। এখানে খুব বেশি স্পেশাল স্টোরি করার সুযোগ থাকে না বা সম্পাদক সাংবাদিককে একটি স্টোরির জন্য খুব বেশি সময় দিতে চান না। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্পেশাল স্টোরি করার সুযোগ খুবই কম। তারপরও সাংবাদিককে স্বাস্থ্য ইস্যুতে কাজ করার সময় বিষয়টির সঙ্গে যত বেশি সম্ভব যুক্ত থাকতে হবে যেন কোনোভাবেই তার কাজটি অতিরঞ্জিত তথা সেনসেশনালাইজড হয়ে না যায়। খেয়াল রাখতে হবে যেন হাজারও সংবাদের ভেতর তার সংবাদটি অডিয়েন্সের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।
* **ক্ষমতায়ন (Empowerment):** এখানে মূলত সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। একজন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক হয়তো একটি রিপোর্টের জন্য ৩০০-৪০০ শব্দের জায়গা পাবেন, একজন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক হয়তো পাবেন দেড় থেকে দুই মিনিট; কিন্তু এই স্বল্প স্থান বা স্বল্প সময়ের ভেতরই অডিয়েন্সকে বুঝিয়ে দিতে হবে স্বাস্থ্য খাতে কী কী ইস্যু রয়েছে এবং এসব বিষয় থেকে তারা (পাঠক) কীভাবে সুবিধা পেতে পারেন। অর্থাৎ একটি ক্যান্সারবিষয়ক প্রতিবেদন পড়ে একজন পাঠক যদি আশঙ্কা করেন তার ক্যান্সার হয়ে থাকতে পারে, তাহলে ওই প্রতিবেদন থেকে তিনি এই ধারণাও পান যে তার এখন কী করণীয়।

এই পাঁচটি উপাদানের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা করা হলে তার কার্যকারিতা অনেক বেশি হতে পারে।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার বিভিন্ন মাধ্যম

বর্তমানে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির সময়ে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি খাতে নিত্যনতুন উদ্ভাবন আমাদের সামনে আসছে। এই পরিবর্তনের হাওয়া আমাদের গণমাধ্যম ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। ফলে গণমাধ্যম তার চিরচেনা চরিত্র হারাচ্ছে এবং একই সঙ্গে নতুনরূপে আবির্ভূতও হচ্ছে। আমাদের পরিচয় ঘটছে কনভারজেন্স জার্নালিজমের সঙ্গে, যেখানে একটি মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাচ্ছি। তাই স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক আধেয় তৈরি করতে পারলে সব ধরনের অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানো অনেক বেশি সহজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার মাধ্যম বা পদ্ধতিগুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

* সংবাদ প্রতিবেদন
* ফিচার স্টোরি
* রেডিও সংবাদ
* টেলিভিশন সংবাদ

* ফটো স্টোরি
* মাল্টিমিডিয়া স্টোরি

একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা একটি বিশেষ বিট বা শাখা হিসেবে যতই স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার কথা বলি না কেন, এই ধরনের সাংবাদিকতা আসলে বিশেষ ইতিবাচক লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যায়। তাই একে যদি আমরা একধরনের অ্যাডভোকেসি বলি, তাহলে ভুল বলা হবে না। আর যখনই আমরা একে অ্যাডভোকেসি আখ্যা দিই, তখনই একটি বৃহৎ লক্ষ্য আমাদের সামনে চলে আসে। এই বৃহৎ লক্ষ্য সামনে রেখে সংবাদমাধ্যমগুলোয় শুধু নয় বরং আরও কিছু যোগাযোগ চ্যানেলে কাজ করার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন বিশ্বজিত ঘোষ ও তার দল। তাদের উল্লিখিত চ্যানেলগুলোয় যেসব উপায়ে কাজ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

* বিনোদনমাধ্যম (নাটক, বিজ্ঞাপন, শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি, চলচ্চিত্র)
* সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার (পেজ, গ্রুপ, ইভেন্ট)
* আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ
* মিডিয়া মিক্স (আন্তর্ব্যক্তিক, গোষ্ঠী, জন ও গণযোগাযোগ, সব মাধ্যমের একতাবদ্ধ ব্যবহার)

সুপারিশ

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা এখন পর্যন্ত খুব বেশি সম্ভাবনাময় নয়। কিন্তু এ কারণে আশাহত হয়ে বসে না থেকে এই ধরনের সাংবাদিকতার গুরুত্ব দ্রুততম সময়ের ভেতর অনুধাবন করে সে অনুযায়ী কাজ করাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। আর এজন্য প্রয়োজন দেশের গণমাধ্যম শিল্পের একদম শীর্ষপর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সংবাদকর্মীদের গঠনমূলক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। বাংলাদেশে কার্যকর স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার পরিবেশ তৈরি করতে হলে আমার মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জরুরি–

* সবার আগে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা বিষয়ে বিদ্যমান ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। এই বিটকে নিয়মিত বিটে পরিণত করতে হবে।
* গণমাধ্যম কর্তাদের ইস্যুটির তাৎপর্য বুঝতে হবে, প্রয়োজনে তাদের জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
* গণমাধ্যমকর্মীদের এই বিটে আগ্রহী করে তুলতে হবে।
* বিশেষ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের 'হেলথ লিটারেট' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
* স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টিংকে 'ফিলার আইটেম' হিসেবে ব্যবহারের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
* স্বাস্থ্য খাতের রাজনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণালাভ করতে হবে এবং এসব বিষয়কে সামনে তুলে ধরতে হবে।
* দেশের অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোয় স্বাস্থ্যবিষয়ক আলাদা পেজ রাখতে হবে।
* হাউসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল কর্মীদের স্বাস্থ্য বিটে রেখে পরিণত কর্মীতে রূপান্তর করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষ কর্মীদের এই বিটে নিয়োগ দিতে হবে।
* শুধু গবেষণা প্রতিবেদন অনুবাদ করে স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদ প্রকাশের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।
* সর্বোপরি, গণমাধ্যমের মুনাফামুখী প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে দেশের সাংবাদিক মহল প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে কোনোভাবেই এতে আশানুরূপ কিছু করা সম্ভব নয়। তাই স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে যে কোনো ধরনের আলোচনা শুরু করার এখনই সময় এবং দেশের সাংবাদিক মহল যদি বিষয়টিকে অন্য সবকিছুর মতো মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে এটি হবে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে বড়ো ধরনের প্রবঞ্চনা।

তথ্যসূত্র

১. Bishwajit, G, José, Y, Junior, RP, Sarker, S, & Sandeep. (2016). Role of Health Journalism in Promoting Communication among Stakeholders in Healthcare Sector. J Health Commun, 1(3), 1-5. doi: 10.4172/2472-1654.100016

২. Harris, G. (2009, September 02). Pfizer Pays $2.3 Billion to Settle Marketing Case. The New York Times. Retrieved from, https://www.nytimes.com/2009/09/03/business/ 03health.html

৩. Dugmore, H. (n.d.). Why Does Health Journalism Matter in Africa? Retrieved from, http://www.european-healthjournalism.com/pdf/ 3%20%20Harry_Dugmore Health_Journalism_why_does_it_matter_edit%2014_May.pdf

৪. Keshvari, M, Yamani, N, Adibi, P, & Shahnazi, H. (2018). Health journalism: Health reporting status and challenges. Iranian J Nursing Midwifery Res, 23, 14-7. doi: 10.4103/ijnmr.IJNMR_158_16

৫. Writing About Health: A Handbook for Journalists in Bangladesh. Retrieved from, https://www.k4health.org/toolkits/ bangladesh-health-journalists

লেখক: শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

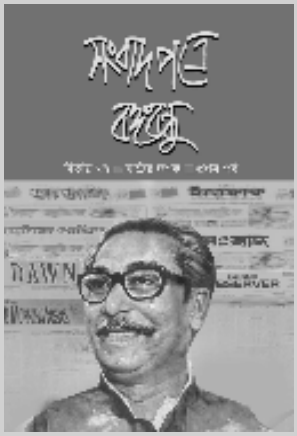

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ

ইতিহাস, ধারণা ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ

মাহামুদুল হক

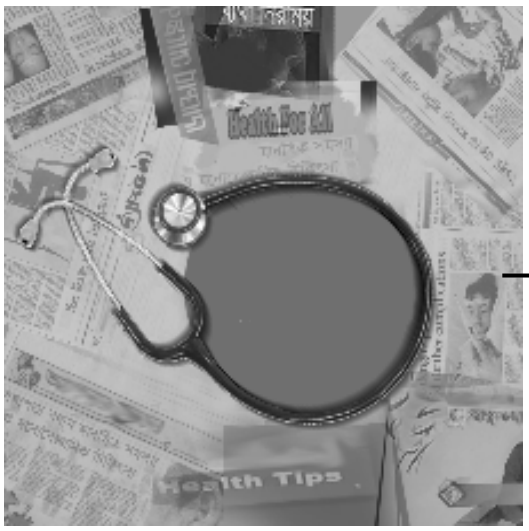

স্বাস্থ্য যোগাযোগ (Health communication) যোগাযোগ বিজ্ঞানের একটি উপক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে, একাধিক জ্ঞানশাখা যেমন– জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিপণন এবং আচরণ বিজ্ঞানের তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে স্বাস্থ্য যোগাযোগ বিজ্ঞানে। স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগ, সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের অনেক প্রসিদ্ধ তত্ত্বের অনুযোগ ঘটেছে। যোগাযোগ বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব এবং কৌশল স্বাস্থ্য যোগাযোগ আওতাভুক্ত করেছে। এটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্যবার্তা প্রচারে মানবীয় ও মাধ্যম যোগাযোগের সমন্বয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে (Health Promotion) কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে পঠিত ও প্রয়োগকৃত। স্বাস্থ্যতথ্য সংগ্রহ, বার্তা উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ভূমিকা পালন করে যোগাযোগ প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ পঠনপাঠন এবং এর কৌশল প্রয়োগে অনেক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান নিবন্ধে স্বাস্থ্য যোগাযোগের ধারণা ও ইতিহাস এবং বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগের পঠনপাঠনসহ এর প্রায়োগিক দিক ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যোগাযোগ

স্বাস্থ্য যোগাযোগ তত্ত্ব এবং এর প্রায়োগিক দিক বোঝার জন্য 'যোগাযোগ' শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। যোগাযোগ হচ্ছে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে তথ্য বা বার্তা বিনিময় প্রক্রিয়া। চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করে তথ্য ও অর্থের উৎপাদন এবং বিনিময় প্রক্রিয়াই হচ্ছে যোগাযোগ। বার্তা উৎপাদন, বিচ্ছুরণ, গ্রহণ ও বার্তা অনুধাবন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় জড়িত। যোগাযোগ হঠাৎ করে ঘটে না বরং উন্নয়ন যোগাযোগে এটি একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ। এটি হচ্ছে তথ্য বা ধারণা বা বিশ্বাস বিনিময়ের একটি প্রক্রিয়া। যোগাযোগ জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে প্রচার করতে বা বিদ্যমান মূল্যবোধগুলোকে পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। কারণ জনতথ্য, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এ প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগ হলো মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরির প্রক্রিয়া।

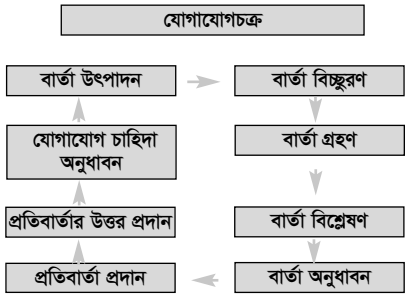

স্বাস্থ্য যোগাযোগ

স্বাস্থ্য যোগাযোগ মানবীয় যোগাযোগের একটি উপশাখা হিসেবে জনগণের আচরণিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য যোগাযোগ হচ্ছে জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে যোগাযোগ সংক্রান্ত ধারণা এবং তত্ত্বগুলোর অধ্যয়ন ও প্রায়োগিকতার অনুশীলন। এই প্রায়োগিকতার অনুশীলন বাচনিক, অবাচনিক বা লিখিত, ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক বা সম্পর্কভিত্তিক হতে পারে, যা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে অবহিত ও প্রভাবিত করে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। স্বাস্থ্য যোগাযোগের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিস্তৃত সংজ্ঞাটি টিউফটস বিশ্ববিদ্যায়ের স্কুল অব মেডিসিন এবং ইমারসন কলেজের যৌথভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্য যোগাযোগ বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে বলা হয়েছে: 'Health communication is ... the art and technique of informing, influencing and motivating individual, institutional and public audiences about important health issues.' স্বাস্থ্য যোগাযোগ হলো ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও উদ্দিষ্ট জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত, প্রভাবিত করা এবং প্রেরণা দেওয়ার শিল্প ও কৌশল। এর পরিধি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য প্রচার, স্বাস্থ্যসেবা নীতি, ব্যবসা এবং সেই সঙ্গে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

'Healthy People 2010' অর্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য যোগাযোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে: 'Health communication encompasses the study and use of communication strategies to inform and influence individual and community decisions that enhance health.' স্বাস্থ্য যোগাযোগ ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে অবহিত করতে এবং প্রভাবিত করতে পারে– এমন যোগাযোগ কৌশলের অধ্যয়ন ও ব্যবহার, যা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়। এটি যোগাযোগ ও স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করে। স্বাস্থ্যশিক্ষার মতো স্বাস্থ্য যোগাযোগও এমন একটি মনোভঙ্গি, যা পূর্বনির্ধারিত সময়ে উদ্দিষ্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য যোগাযোগ আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতিগত উপায়। স্বাস্থ্য যোগাযোগ হলো স্বাস্থ্যকর আচরণ বিনির্মাণের পক্ষে উদ্দিষ্ট জনগণের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস এবং আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য বার্তার উৎপাদন ও বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া। Renata Schiavo তার Health Communication: From Theory to Practice গ্রন্থে স্বাস্থ্য যোগাযোগের নিম্নোক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন:

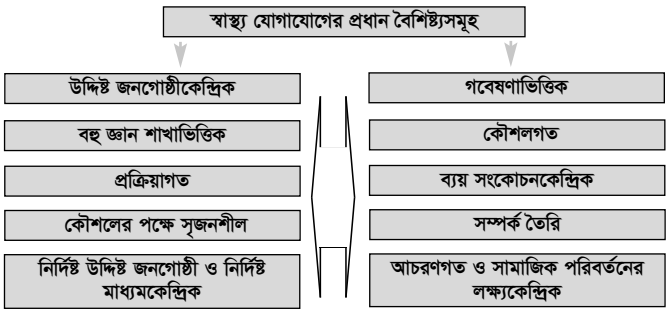

স্বাস্থ্য যোগাযোগের ইতিহাস

জ্ঞানের শাখা হিসেবে স্বাস্থ্য যোগাযোগ পঠনপাঠন খুব বেশি দিনের নয়। তবে স্বাস্থ্য যোগাযোগের শেকড় প্রাচীন গ্রিসে গ্রথিত। আধুনিক ওষুধের জনক এবং গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রিটাস প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করেন যে রোগবালাই প্রাকৃতিকভাবেই হয়, কুসংস্কার ও দেবতার কারণে নয়। তিনি এই ধরনের স্বাস্থ্যবার্তা চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, চিকিৎসক অনুসন্ধানমূলক তথ্য এবং চিকিৎসা পদ্ধতি অন্য চিকিৎসকের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য যেন রেকর্ড রাখেন। এটি স্বাস্থ্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ। চিকিৎসক এবং অন্য চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের আদানপ্রদান থেকে এ ধারণা উদ্ভূত হয়। গ্রিক দ্বীপপুঞ্জ কোসে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০০ সালের দিকে জন্মগ্রহণকারী হিপোক্রিটাসের 'হিপোক্র্যাটিক তত্ত্ব' এবং 'হিপোক্র্যাটিক প্রতিজ্ঞা' সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বার্তাগুলো স্বাস্থ্য যোগাযোগের একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিগত তিন দশকে স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। গত অর্ধশতকে স্বাস্থ্য যোগাযোগ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাস্থ্য যোগাযোগ কমপক্ষে চারটি যুগ অতিবাহিত করেছে। চারটি যুগ হলো:

ক. ক্লিনিক যুগ (Clinic Era)
খ. মাঠ যুগ (Field Era)
গ. সামাজিক বিপণন যুগ (Social Marketing Era)
ঘ. কৌশলগত যুগ (The era of strategic behaviour change communication)

ক. ক্লিনিক যুগ (Clinic Era): ষাটের দশকে স্বাস্থ্য যোগাযোগকে মূলত ক্লিনিক যুগ বা চিকিৎসা যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ক্লিনিক যুগটি চিকিৎসাসেবা মডেল ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। রোগবালাই থেকে মুক্তি পেতে জনগণ ক্লিনিকগুলোকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করত। ক্লিনিক তৈরি করলে রোগী আসবে– এটাই ছিল এ যুগের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই যুগে স্বাস্থ্য যোগাযোগের সাফল্যে মূলত চিকিৎসক দ্বারা রোগীদের উপদেশ দেওয়ার ওপর নির্ভর করা হতো।

খ. মাঠ যুগ (Field Era): মাঠ যুগে আরও কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। মাঠকর্মী, সম্প্রদায়ভিত্তিক বিতরণ এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণের ব্যবহার করা হতো এ যুগে। এর মধ্যে রয়েছে পোস্টার, লিফলেট, রেডিও সম্প্রচার ও ভ্রাম্যমাণ ইউনিট। সত্তরের দশকে স্বাস্থ্য যোগাযোগকারীরা মূলত মাঠপর্যায়ে জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। মাঠপর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ মডেল থেকে এ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, যার বেশির ভাগ মুদ্রিত উপকরণ এবং ভিজুয়াল উপকরণ ছিল। যোগাযোগকারীরা এই সময়ে একমুখী যোগাযোগের চেয়ে মিথস্ক্রিয় বা সংলাপের ওপর জোর দেন।

গ. সামাজিক বিপণন যুগ (Social Marketing Era): বাণিজ্যিক বিপণন থেকে সামাজিক বিপণনের যুগটি বিকশিত হয়েছিল। বাণিজ্যিক বিপণন ধারণা অনুযায়ী ভোক্তারা তাদের পছন্দসই পণ্য ভর্তুকি মূল্যে ক্রয় করে। ব্যাপক প্রচারিত ব্র্যান্ডেড পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি, অন্যদিকে স্থানীয় দোকান-বাজারে সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত হতো আশির দশকে। এ সময় যোগাযোগের বিপণন কৌশলগুলো এ বাণিজ্যিক ক্ষেত্র থেকে এসেছে।

ঘ. কৌশলগত যুগ (The era of strategic behaviour change communication): বর্তমানে চলছে কৌশলগত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের যুগ। এ যুগ ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য আচরণগত বৈজ্ঞানিক মডেলগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ এবং নীতি পরিবেশকে প্রভাবিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। নব্বইয়ের দশক থেকে এখন অবধি স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশলগত যুগ প্রবহমান। বহুমাধ্যম ব্যবহার, অংশীজনদের সংখ্যা বৃদ্ধি, মূল্যায়ন ও প্রমাণভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন, জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিতকরণ, অধিক প্রভাবিতকরণ মাধ্যমের ব্যবহার এবং একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া যেখানে যোগাযোগকারী ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী উভয়ই অংশীদারিত্ব ও আন্তঃবিনিময় পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

বহু জ্ঞান শাখার অনুপ্রবেশ ঘটেছে স্বাস্থ্য যোগাযোগ বিজ্ঞানে। স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত নৃবিজ্ঞান, বিচ্ছুরণতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান, নার্সিং, সামাজিক বিপণন এবং রাজনীতিবিজ্ঞান। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কার্ল রজার্স,

জুরগেন রুশ, গ্রেগরি বাটসনসহ বিদগ্ধজন। তাঁরা মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে থেরাপিউটিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা স্বাস্থ্য যোগাযোগ অনুসন্ধানের বিকাশে (গবেষণা, শিক্ষা ও প্রচার) সহায়তা করেছে। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বাস্থ্য যোগাযোগের বিকাশে প্রধান অবদান রেখেছে।

ক. বহু জ্ঞান শাখার অবদান
খ. পেশাগত অনুষ্ঠান
গ. স্বাস্থ্য যোগাযোগ সম্পর্কিত বই
ঘ. স্বাস্থ্য যোগাযোগবিষয়ক জার্নাল
ঙ. স্বাস্থ্য যোগাযোগবিষয়ক শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি

স্বাস্থ্য যোগাযোগের ভূমিকা

স্বাস্থ্য যোগাযোগ একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিবাচক স্বাস্থ্য আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের 'Making Health Communication Programs Work' শীর্ষক গাইডে স্বাস্থ্য যোগাযোগের নিম্নোক্ত ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে:

* স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
* উপলব্ধি, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে, যা সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটায়।
* স্বাস্থ্যাভ্যাস ত্বরান্বিত করে।
* স্বাস্থ্যকর দক্ষতা প্রদর্শন বা চিত্রায়ণ করে।
* জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণকে শক্তিশালী করে।
* আচরণ পরিবর্তনের সুবিধাগুলো তুলে ধরে।
* স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা বা নীতিমালার বিষয়ে একটা অবস্থান তৈরির পক্ষে কাজ করে।
* স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা সৃষ্টি বা সেবা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
* মিথ ও মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করে।
* প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদার করে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ পঠনপাঠন: বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানে জনস্বাস্থ্য শাখার অংশ হিসেবে মূলত স্বাস্থ্য যোগাযোগের ধারণাগত দিকটি অধ্যয়ন করা হতো। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা শাখা। যদিও স্বাস্থ্য যোগাযোগের বিষয়টি বিভিন্ন জ্ঞান শাখায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে; কিন্তু জনস্বাস্থ্য ডিসিপ্লিনের অংশ হিসেবে এটি পঠনপাঠন হয় বাংলাদেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কোর্স হিসেবে সম্প্রতি পড়ানো হচ্ছে স্বাস্থ্য যোগাযোগ। স্বাস্থ্য যোগাযোগের ওপর বাংলাদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। বেশির ভাগ গবেষণায় এর প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে স্বাস্থ্য যোগাযোগ কী ভূমিকা রেখেছে, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এসব গবেষণার বেশির ভাগ হয়েছে এনজিও'র প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে। এসব গবেষণায় পদ্ধতিগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ জরিপ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। যোগাযোগ জরিপ গবেষণা (Communication Survey Research) পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী হলেও তা বাংলাদেশে পরিচিতি পায়নি। ১৯৯৯ সালে 'The Role of NGO Communication in Promoting Rural Health: A Study on a Village in Bangladesh' শীর্ষক এক একাডেমিক গবেষণায় প্রথম এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। সিজার এম মার্কাডো এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। শিক্ষায়তনিক গবেষণা খুব বেশি হয়নি, তবে স্বাস্থ্য যোগাযোগের ওপর গবেষণার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে একাডেমিশিয়ানদের মধ্যে।

প্রায়োগিক ক্ষেত্র: স্বাস্থ্য যোগাযোগের প্রায়োগিক ক্ষেত্র আজ অনেক বিস্তৃত। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যের উন্নয়নে স্বাস্থ্য যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করছে, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তবে স্বাস্থ্য যোগাযোগ একটি পরিকল্পিত কর্মকৌশলগত প্রক্রিয়া। স্বাস্থ্য বার্তা তৈরি, মাধ্যম নির্বাচন ও বার্তা বিচ্ছুরণ সঠিকভাবে না হলে তা কার্যকরী হয় না। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগের কর্মসূচিগুলোকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি বলা হয়। বেশির ভাগ এনজিওর কর্মসূচি এ ধরনের। শুধু সচেতন হলেই হয় না। মানুষের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ছাড়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঘটেছে বলা যায় না। এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয় মূলত প্রকল্প অভিজ্ঞতার আলোকে। 'কাজ করতে করতে শেখা'– এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচিগুলো নেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। অথচ স্বাস্থ্য যোগাযোগ একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, যেখানে যোগাযোগ হচ্ছে এর মূলশক্তি। এদেশে যোগাযোগবিদদের স্বাস্থ্য যোগাযোগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্য যোগাযোগ কর্মসূচিগুলো শুধু সচেতনতামূলক কর্মসূচি হওয়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে তেমন সফল হয় না। এক গবেষণায় এনজিওর চারটি স্বাস্থ্য ইস্যুতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। যোগাযোগ জরিপ গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পর টি-টেস্ট করা হয়। নিচের ছকে দেখলে বোঝা যায়, স্বাস্থ্য যোগাযোগ কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য যোগাযোগ গবেষণার ফলাফল

স্বাস্থ্য ইস্যু	জ্ঞানস্তর	দৃষ্টিভঙ্গি স্তর	আচরণগত স্তর
পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি
খাদ্য ও পুষ্টি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন
নারীস্বাস্থ্য	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি
শিশুস্বাস্থ্য	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি
দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য যোগাযোগ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ:

* অপরিকল্পিত ও দুর্বল যোগাযোগের কৌশল প্রণয়ন।
* কাজ করতে করতে শেখা– এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সময় বেশি লাগে, সাফল্য কম আসে।
* মিডিয়া ফোকাস করা হয়, স্বাস্থ্যবার্তা নয়।
* পশ্চিমা যোগাযোগ মডেল ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। যেমন– বাংলাদেশের এইচআইভি/এইডস যোগাযোগ কর্মকৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচআইভি/এইডস যোগাযোগ কর্মকৌশলকে হুবহু কপি করে।
* বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য যোগাযোগ কর্মসূচি আলাদাভাবে নেওয়া হয় না, অন্যান্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবার্তা প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্র্যাক ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি কর্মসূচি ১৯৭৯ সালে চালু করেছিল। এটা স্বাস্থ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে সফল কর্মসূচি। ডায়রিয়ায় ষাটের দশকে হাজার হাজার মানুষ মারা যেত। এক চিমটি লবণ, এক মুষ্টি গুড় ও আধা লিটার পানি দিয়ে তৈরি খাবার স্যালাইনকে জনপ্রিয় করেছিল এ স্বাস্থ্য যোগাযোগ। এখন সকলেই জানে ডায়রিয়া হলে স্যালাইন খেতে হয়। এটা ওই স্বাস্থ্য যোগাযোগ কর্মসূচির সফলতা। আরেকটি সফল স্বাস্থ্য যোগাযোগ কর্মসূচির নাম সরকারের Expanded Programme on Immunization (EPI) কর্মসূচি। ১৯৭৭ সালে কাজাখস্তানে ডব্লিউএইচও কর্তৃক এ কর্মসূচি প্রথম চালু হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচি চালু হয়। সরকারের আরেকটি কর্মসূচি পরিবার পরিকল্পনা প্রজনন স্বাস্থ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯৭১ সালে দেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল ৩ শতাংশ, যা বর্তমানে ৬০ শতাংশের উপরে। ব্র্যাক কর্তৃক ১৯৮৪ সাল থেকে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডব্লিউএইচও কর্তৃক সুপারিশকৃত Directly Observed Theraphy Short-Course (DOTS) পদ্ধতিকে স্বাস্থ্য যোগাযোগের আরেকটি সফলতার গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

স্বাস্থ্যই সব সুখের মূল। একটি জাতি যত উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী, ওই জাতি তত উন্নত। স্বাস্থ্য যোগাযোগ স্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য স্বাস্থ্য যোগাযোগ কৌশল পরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বাংলাদেশ

নিখিল মানখিন

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে গড় আয়ু যেমন সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে, তেমনি ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হারও সবচেয়ে কম। ল্যানসেট প্রকাশিত এক আর্টিক্যালে গবেষকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশ উল্লিখিত সাফল্যলাভ করলেও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশিত অর্জন হয়েছে– এমনটা বলা যাচ্ছে না। বিচ্ছিন্নভাবে যেসব কার্যক্রম চলছে, তা মিলিয়েও বিশ্বে তুলনামূলক চিত্রে নিজেদের অবস্থান ৫০ শতাংশের উপরে তুলতে পারছে না বাংলাদেশ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, মোকাবিলা করতে হবে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ। দেশের ক্ষুদ্র আয়তন ও সীমিত সম্পদের বিপরীতে রয়েছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের অভাব। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য এখনো আকাশচুম্বী। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিনামূল্যের নামে বিদ্যমান সেবার মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চমূল্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। স্বাস্থ্যবিমা শুরু হলেও তা দেশের মাত্র একটি জেলার তিনটি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু রয়েছে। পূর্ণ আস্থা না থাকায় প্রতিবছর প্রায় কয়েক লাখ বাংলাদেশি রোগী উন্নত চিকিৎসা নিতে বিদেশে পাড়ি জমায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবার ব্যয় অনেকের জন্যই আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল কথা হচ্ছে– সব মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা পাবে। চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কেউ দরিদ্র হয়ে পড়বে না। উদ্দেশ্য অর্জনে কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি অপচয় ও দুর্নীতি কমাতে হবে, স্বাস্থ্যবিমা মানুষকে সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেবে।

ইউএইচসি সূচকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পেছনের সারিতে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রতিবেদনে উঠে এসেছে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির চিত্র। তথ্য মোতাবেক সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বেশ পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। মানুষের চিকিৎসার জন্য

নিজের পকেট থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ যায় বাংলাদেশে, যা দেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য অশনিসংকেত। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৫০ শতাংশ। অথচ এই সূচকে ভুটান ৭২, নেপাল ৬২, শ্রীলঙ্কা ৬৮, ইন্দোনেশিয়া ৬১, মালদ্বীপ ৭২, দক্ষিণ কোরিয়া ৭৮ ও থাইল্যান্ড সর্বোচ্চ ৮৮ শতাংশ অবস্থানে রয়েছে। এই ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশে ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হয় সর্বোচ্চ ৬৭ শতাংশ। এছাড়া থাইল্যান্ডে ১২, মালদ্বীপে ১৬, ভুটানে ২০, নেপালে ৬০, ভারতে ৬৫, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৮ ও শ্রীলঙ্কায় ৩৮ শতাংশ ব্যয় হয় ব্যক্তির।

স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি

২০১৭ সালে প্রকাশিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিটের তৈরি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস ১৯৯৭-২০১৫' প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের স্বাস্থ্য খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার ২৩ ভাগ বহন করে সরকার আর ৬৭ ভাগ ব্যয় করে ব্যক্তি নিজে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য নিজের পকেট থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে। ২০১২ সালে মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৩ শতাংশ বহন করত ব্যক্তি। আর এখন তা বেড়ে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। আর এনজিও ও দাতা সংস্থাগুলো বহন করছে ১০ শতাংশ। স্বাস্থ্য ব্যয় বাড়লেও সরকারি অংশের খরচ কমেছে।

স্বাস্থ্যবিমার কার্যক্রম কম

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোগীর সুরক্ষায় স্বাস্থ্যবিমা থাকলেও বাংলাদেশে এখনো এ সেবা সফলভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্যবিমা শুরু হলেও তা দেশের মাত্র একটি জেলার তিনটি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু রয়েছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যবিমায় আগ্রহী করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দেশে প্রচলিত প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিমা খুব গ্রহণযোগ্য না হলেও গ্রুপ স্বাস্থ্যবিমা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বহু প্রতিষ্ঠান এই গ্রুপ স্বাস্থ্যবিমা করছে। এর বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামীণ ব্যাংকসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আঙ্গিকে স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে। অন্যদিকে কমিউনিটি পর্যায়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ আরও কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে। সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকার পরও দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যসেবা পেতে বিমা করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া আগে টাকা দিয়ে পরে সেবা গ্রহণের মনোভাব না থাকা এবং একজনের টাকায় অন্যজনের চিকিৎসা– এ বিষয়েও অনীহা রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর উন্নত দেশ এবং কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোয় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা অনেকাংশে বিমার ওপর নির্ভরশীল। ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটাতে সেসব দেশের জনগণকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয় না। অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা পেতে স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৭ ভাগ নিজ পকেট থেকে খরচ করতে হয়। স্বাস্থ্যসেবা পেতে স্বাস্থ্যবিমায় অনাগ্রহের কারণে অধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনা যাচ্ছে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৭ উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম সবার জন্য সুস্বাস্থ্য। কারণ দেশের সব ধরনের উন্নয়নের স্থায়িত্বের জন্য সবার আগে প্রয়োজন জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এজন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্যবিমার বিকল্প নেই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যবিমার প্রতি অনাগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিত করা সহজ নয়। এর জন্য সমন্বিত (সরকারি-বেসরকারি) উদ্যোগ প্রয়োজন। এদিকে ২০৩০ সালের মধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২০১৭ সালে প্রকাশিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিটের তৈরি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস ১৯৯৭-২০১৫' প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের স্বাস্থ্য খাতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার ২৩ ভাগ বহন করে সরকার আর ৬৭ ভাগ ব্যয় করে ব্যক্তি নিজে

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা

নামমাত্র খরচে চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায় সরকারি হাসপাতালে। অপারেশন, সিসিইউ, আইসিসিইউ ও ডায়ালাইসিস সেবার ক্ষেত্রে কোনো টাকা নেওয়া যাবে না। তবে বেশকিছু পরীক্ষা করাতে স্বল্প ফি নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও সরকারি ফি বেসরকারি হাসপাতালের ফির তুলনায় অনেক গুণ কম। সরকারি হাসপাতালে করোনারি এনজিওগ্রামে ২ হাজার টাকা, সিটি স্ক্যানে ২ হাজার, এমআরআই ৩ হাজার, ইসিজি ৮০, ইকোকার্ডিওগ্রাম ২০০, এক্সরে ২০০, আল্ট্রাসনোগ্রাম ৩০০, কার্ডিয়াক ক্যাথ ২ হাজার, ইউরিন ৩০ এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন ও টোটাল কাউন্ট করাতে লাগে মাত্র ১০০ টাকা। সব হাসপাতালে ওষুধ ও অন্য সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিনামূল্যের চিকিৎসায় ফি দিতে হয় সরকারি হাসপাতালে। জরুরি বিভাগ থেকে রোগীর শয্যা পর্যন্ত পৌঁছার চিকিৎসা ব্যয় (ট্রলিম্যান ও শয্যা জোগানদাতা) লিখিত থাকে না। শয্যায় ওঠার পর চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ফি নেই। তবে অনেক পরীক্ষা বাইরে গিয়ে করাতে হয়। উচ্চমূল্যের ওষুধ এবং চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে লেখা কোম্পানির ওষুধ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পাওয়া না গেলেই রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। চিকিৎসকের ফি এবং রোগীর খাবারের ক্ষেত্রে কোনো টাকা দিতে হয় না। চুক্তিবদ্ধ বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার জন্য রোগী পাঠিয়ে সরকারি হাসপাতালে ফ্রি রোগী দেখার টাকা উঠিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখান অনেক চিকিৎসক। অনেক সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে নিয়ে যেতে ট্রলিম্যানদের টাকা দিতে হয়।

বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা

বেসরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসাসেবার খরচ অনেকটা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। প্রতিটি অপারেশনে ১০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা লাগে। প্রতিদিন সিসিইউ সেবা পেতে ৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং আইসিইউ সেবা পেতে লাগে ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। প্রতি সেশনে ডায়ালাইসিস করাতে খরচ হয় প্রায় ৫ হাজার টাকা। এভাবে করোনারি এনজিওগ্রামে ১৫ হাজার, সিটি স্ক্যানে ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার, এমআরআই ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার, ইসিজি ৩০০, ইকোকার্ডিওগ্রাম ১ হাজার থেকে ২ হাজার ৮০০, এক্সরে ৫০০, আল্ট্রাসনোগ্রাম ১ হাজার থেকে ৩ হাজার, কার্ডিয়াক ক্যাথ ১৫ হাজার, ইউরিন ২০০ এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন ও টোটাল কাউন্ট করাতে লাগে ৪৫০ টাকা। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের এক সদস্যের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে যাওয়া মানেই যেন ওই পরিবারের নিঃস্ব হওয়ার প্রাথমিক ধাপ। হাসপাতালে একদিন চিকিৎসাধীন থাকলেই কয়েক লাখ টাকা বিল ওঠার ঘটনাও ঘটছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিতে অনেক বেসরকারি হাসপাতালের কর্তাব্যক্তি গড়ে তুলেছেন শক্তিশালী দালাল বাহিনী। রোগীকে সুস্থ করে তোলা নয়, ভাগিয়ে এনে নিজেদের হাসপাতালের বেডে শুইয়ে দিতে পারলেই চড়তে থাকে চিকিৎসা বিলের পারদ। মৃত রোগীকে আইসিইউতে রেখে বিল আদায়ের ঘটনাও ঘটছে। অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বেসরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এমন নিয়ন্ত্রণহীন অমানবিক মানসিকতা এবং বেশি মাত্রায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রেখে দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন

ল্যানসেটের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্যোগ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। এ উদ্যোগে বড়ো বাধা স্বাস্থ্য খাতের অদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখা কঠিন। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের 'দ্য পাথ টু ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বাড়তি অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষ জনবলের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পাশাপাশি গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মী ধরে রাখার জন্য বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নিতে হবে।

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে 'কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'। চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়, সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং সংস্কার করার জন্য প্রচলিত সরকারি নীতিমালা সময়সাপেক্ষ ও জটিল হওয়ায় সেটি প্রায়ই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অন্তরায় হয়ে উঠে। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও গরিববান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা বেশ দৃশ্যমান। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ওষুধ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা, জনবলের অভাব, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা ও প্রশাসনের জটিলতা এবং সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিক সন্তোষজনক নয়। স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত। এতে দেশের মোট জনসংখ্যার বড়ো অংশ এখনো বিভিন্ন জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারে না। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এখনো অনেকটাই জেলা ও বিভাগকেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

শেষকথা

স্বাস্থ্যবিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। গত বছরেও স্বাস্থ্য সেক্টরের উন্নয়নের চিত্র ছিল আশাব্যঞ্জক। দেশের সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার নেটওয়ার্ক। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে সার্বক্ষণিক হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে, যেখানে ১৬২৬৩ নম্বরে কল করলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্বাস্থ্যতথ্য পাওয়া যায়। এমন মজবুত অবকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাত্রার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, ওষুধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম প্রভৃতি উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। দেশের ৯৯ ভাগ উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা। বর্তমানে প্রতিমাসে ৮০ লাখ থেকে ৯০ লাখ মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নেন। প্রায় ৯১.৩ শতাংশ শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১০ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বেড়েছে সাতগুণ। পোলিও এবং ধনুষ্টংকারমুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এখনো দৃশ্যমান নয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় পড়ে এমন কিছু উদ্যোগ বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়নাধীন থাকলেও সেগুলো দেশে 'পূর্ণাঙ্গ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বাস্তবায়নে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশের স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামোর বিস্তার ঘটেছে। বেড়েছে সেবার মান। গড়ে উঠেছে দক্ষ জনবল। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করতে হলে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে সবার অংশগ্রহণ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা স্লোগান হিসেবে শুনতে ভালো; কিন্তু এই জনবহুল দেশে বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। অর্থ ছাড়া মানসম্পন্ন সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করতে হলে স্বাস্থ্য, অর্থ, জনপ্রশাসনসহ আরও বেশকিছু মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

লেখক: সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা, বিরল রোগ এবং নৈতিকতা

বিনয় দত্ত

স্বাস্থ্য কী?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮৪ সালে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে– 'Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.'

অর্থাৎ স্বাস্থ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ ভালো থাকার একটি অবস্থা। শুধু রোগবালাই অথবা দুর্বলতা বা বৈকল্যের (প্রতিবন্ধিতার) অনুপস্থিতিই স্বাস্থ্য নয়।

এ থেকে স্বাস্থ্যের একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের অবস্থার মিল বা অমিল যা-ই থাকুক না কেন– স্বাস্থ্য কী, তা বুঝতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আরও ১০টি মানদণ্ড তৈরি করেছে, যা হলো:

১. কর্মশক্তিসম্পন্ন– স্বাভাবিকভাবে জীবনের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
২. আশাবাদী– সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে পারে।
৩. নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়া, ঘুম ভালো হওয়া।
৪. পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, বিভিন্ন অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে।
৫. সাধারণ সর্দি ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক শক্তি আছে।
৬. ওজন সঠিক, শরীরের গাঠনিক দিক সঠিক।
৭. চোখ উজ্জ্বল, কোনো প্রদাহ রোগ নেই।
৮. দাঁত পরিষ্কার এবং সতেজ, ব্যথা নেই, দাঁতের মাড়ির রং স্বাভাবিক।
৯. চুলে উজ্জ্বলতা আছে, খুশকি নেই।
১০. হাড় স্বাস্থ্যবান, পেশি ও ত্বক নমনীয়, হাঁটাহাঁটি করলে কোনো অসুবিধা নেই।

স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন

স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পাঠক বা জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে–

* স্বাস্থ্য কী? সেই সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া
* স্বাস্থ্য বা সুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

* বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের অর্থায়ন
* বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট
* বাংলাদেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া
* মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক, পিতৃস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা
* পানিবাহিত রোগ, সংক্রামক রোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
* নতুন কোনো রোগের উৎপত্তি হলে সেই বিষয়ে অবহিত করা
* টিকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা, টিকা দেওয়ার সুফল এবং টিকা না দেওয়ার ফলে কী কী ধরনের ভয়াবহ রোগের উৎপত্তি হবে, তা জানানো
* এইচআইভি এইডসসহ ভয়ানক রোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
* হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম তুলে ধরা
* স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিসহ স্বাস্থ্য খাতের অনিয়ম সবাইকে জানানো
* কীভাবে স্বাস্থ্য খাতকে আরও সুন্দর করে সাজানো যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্যবিবরণী তুলে ধরা
* স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় জানানোসহ গোটা স্বাস্থ্য খাতের আদ্যোপান্ত সবাইকে অবহিত করা স্বাস্থ্য প্রতিবেদনের অংশ।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে বিরল রোগ

স্বাস্থ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে মানুষ বিরল সব রোগের উৎপত্তি এবং রোগ সম্পর্কে ধারণা পায়। সম্প্রতি এমন কিছু রোগ সম্পর্কে আমরা জেনেছি, যা সত্যিই বিরল।

'এপিডার্মোডিসপ্লাসিয়া ভেরাসিফরমিস' নামের বিরল রোগ ছবি: সংগৃহীত

খুলনার পাইকগাছা সদরের সরলগ্রামের বাসিন্দা আবুল বাজনদার। ২৫ বছর বয়সি এই যুবকের দুই হাতের তালুর চামড়া এবং ১০টি আঙুল প্রসারিত হয়ে অনেকটাই গাছের শিকড়ের মতো আকার নিয়েছে। পায়ের আঙুল আর তালুতেও একই অবস্থা। হাত ও পায়ের নখগুলো হারিয়ে গেছে সেই 'শিকড়ের' ভেতর।

চিকিৎসকরা বলছেন, এটি বিরল রোগ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি 'এপিডার্মোডিসপ্লাসিয়া ভেরাসিফরমিস' বা ট্রিম্যান (বৃক্ষমানব) নামে পরিচিত। জিনগত এবং একধরনের ভাইরাসের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

আবুলের মা আমেনা বেগম ও বাবা মানিক বাজনদার। আমেনা বেগম বলেন, ১০ বছর ধরে এই রোগে ভুগছে আবুল। অনেক চিকিৎসককে দেখালেও ভালো হয়নি, বরং অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে।

আবুলের বয়স যখন ১৫ বছর, তখন তার ডান হাঁটুর নিচে আঁচিলের মতো একধরনের গোটা উঠতে থাকে। পরে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত এবং দুই পায়ের হাঁটু পর্যন্ত আঁচিলে ভরে যায়। হাত ও পায়ে গজানো শিকড়কে খুব ভারী মনে হয় আবুলের। এগুলো থেকে মাঝে মাঝে উৎকট গন্ধও তৈরি হয়। খাওয়া থেকে শুরু করে কোনো কাজই নিজে নিজে করতে পারেন না।

আট ভাইবোনের মধ্যে আবুল ষষ্ঠ। আরেকটি বিষয় হলো, আবুল ছাড়া পরিবারের আর কোনো সদস্যের মধ্যে এই রোগ নেই। আবুল বাজনদারের এই বিরল রোগ সম্পর্কে সবাই জানতে পারে গণমাধ্যমের বরাতে।

শুধু আবুল বাজনদার নন, মুক্তামণির কথা আমাদের সবারই মনে আছে নিশ্চয়। মুক্তামণিও বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

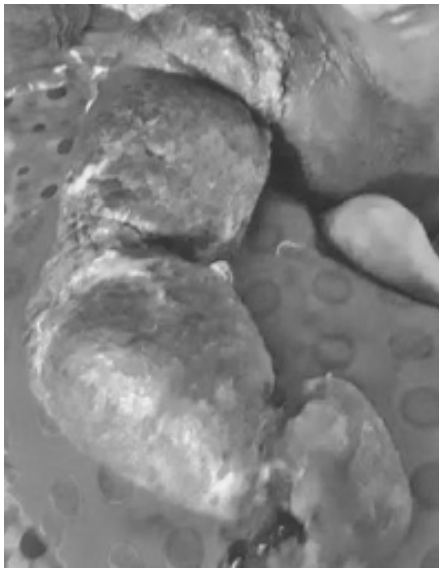

রক্তনালিতে টিউমারের মতো বিরল রোগ ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরার কামারবাইশালের মুদি দোকানদার ইব্রাহিম হোসেনের দুই যমজ মেয়ে হীরামণি ও মুক্তামণি। জন্মের দেড় বছর পর থেকে মুক্তামণির সমস্যা শুরু হয়। প্রথমে হাতে টিউমারের মতো দেখা দেয়। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত টিউমারটি তেমন বড়ো হয়নি। কিন্তু পরে তা ফুলে কোলবালিশের মতো হয়ে যায়। মুক্তামণি বিছানায় বন্দি হয়ে পড়ে। হাতে পুঁজ জমে থাকায় তা থেকে সবসময় দুর্গন্ধ বের হতো। হীরামণি ছাড়া অন্য কোনো শিশু এমনকি বড়োরাও তার কাছে যেতেন না। রক্তনালিতে টিউমারের মতো বিরল রোগে আক্রান্ত মুক্তামণি। বিরল রোগে ভুগতে ভুগতে একসময় মুক্তামণি মারা যায়।

'প্রজেরিয়া' নামের বিরল রোগ ছবি: সংগৃহীত

আরেকটি বিরল রোগ প্রজেরিয়া। কম বয়সেই বুড়িয়ে যায় এ রোগে আক্রান্ত মানুষ। শরীরে ভর করে বার্ধক্যের ছাপ। জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় প্রজেরিয়া আক্রান্ত তুহিন ইসলামের কথা জানা যায় গণমাধ্যমের কল্যাণে। অল্পবয়স্ক তুহিনকে দেখলে মনে হবে বয়সের ভারে ন্যুব্জ। আসলে তুহিনের বয়স অল্প। এটাই এ রোগের প্রধান উপসর্গ।

চিকিৎসকরা জানান, এই রোগের ফলে চামড়া কুঁচকে যায়। শুরু হয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। চুল উঠে যেতে শুরু করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বার্ধক্য পদ্ধতি দমানো বা এই অসুখ নিরাময়ের কোনো ওষুধ তৈরি হয়নি।

বিরল রোগের ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ভূমিকা

স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কোনো জায়গায় নতুন রোগের উপসর্গ দেখা দিলে সেই বিষয়ে বিশদ প্রতিবেদন করা এবং তা থেকে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রতিবেদক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদন করতে প্রতিবেদককে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে তা হলো:

* বিরল রোগ বা নতুন রোগ সম্পর্কে জানা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে রোগী ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি করা
* স্বাস্থ্যবিষয়ক সংকট মোকাবিলা, জরুরি সেবা সম্পর্কে অবহিত করা
* রোগ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন
* স্বাস্থ্য সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা
* স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি উপাদানগুলো চিহ্নিত করা
* রোগের উপসর্গ এবং উৎপত্তির বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া
* রোগের বিস্তৃতির বিষয়ে অবহিত করা
* রোগ প্রতিকারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ
* সর্বোপরি স্বাস্থ্যের ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করে তা জানানো।

স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় নৈতিকতা

সাংবাদিক স্বাধীন; কিন্তু তাদের কিছু নিয়মনীতি, আইন মেনে চলতে হয়। মানদণ্ড মনে রাখতে হয়। নৈতিকতায় আবদ্ধ থাকতে হয়। নৈতিকতা না মেনে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা হয় না। যেসব বিষয় স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় অবশ্যই করণীয়, তা হলো:

* সত্যনিষ্ঠ থাকা
* তথ্যনিষ্ঠ থাকা
* স্বাধীন থাকা
* পক্ষপাতশূন্য থাকা
* জনগণের প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ তথ্য তুলে ধরা
* অর্ধসত্য না বলা
* তথ্য বিকৃত না করা
* অন্যের লেখা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকা
* সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে সংবাদ উপস্থাপন
* সব পক্ষের কথা সঠিকভাবে শোনা এবং বোঝা
* ভিকটিমের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা
* ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা
* ওষুধের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ না করা
* ব্যক্তি বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা
* হাসপাতালের দুর্নীতি বা অনিয়ম ছাপার ব্যাপারে কোনো স্বার্থ না দেখা
* হাসপাতালে কেন মানুষ সেবা পান না বা প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা
* সর্বোপরি নিজেকে নৈতিকতার মানদণ্ডে রেখে প্রতিবেদন তৈরি করা।

পরিশেষে বলা যায়, সাংবাদিকতায় নতুন একটি ধারা তৈরি করেছে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা। শুরুতে এই বিটের সাংবাদিককে অনেক চাপ নিতে হলেও এখন তারা সহজে এগিয়ে যেতে পারছেন। সম্পাদক বা মালিক পক্ষের আগ্রহের জায়গাও তৈরি করে নিয়েছেন তারা। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, স্বাস্থ্য সাংবাদিকতার কারণে জনগণ অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠছেন। ফলে প্রতিকার বা প্রতিরোধে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন।

তথ্যসূত্র

১. মোড়ল, শিশির, স্বাস্থ্য সন্ধান, সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিষয়ক গণমাধ্যম সহায়িকা (২০১৬), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
২. স্বাস্থ্যবিষয়ক রচনা, সাংবাদিক সহায়িকা (২০১৩), ইউএসএআইডি, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ক্যালভারটন, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র: এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এমিনেন্স) ও আইসিএফ, ম্যাক্রো
৩. স্বাস্থ্য, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ
৪. চৌধুরী, ইকবাল হোসাইন, জয়পুরহাটে 'পা', প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০১০
৫. মণ্ডল, উত্তম, বিরল রোগ, শিকড়ের মতো হয়ে যাচ্ছে হাত-পা, প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬
৬. নুর, মর্তুজা, বিরল রোগ ও একজন সামান্তলাল সেন, এনটিভি অনলাইন, ১৯ আগস্ট ২০১৭
৭. চৌধুরী, সুভাষ, বিরল রোগে আক্রান্ত মুক্তামণি আর নেই, এনটিভি অনলাইন, ২৩ মে ২০১৮

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্মতা বজায় রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ

মিনহাজ উদ্দীন

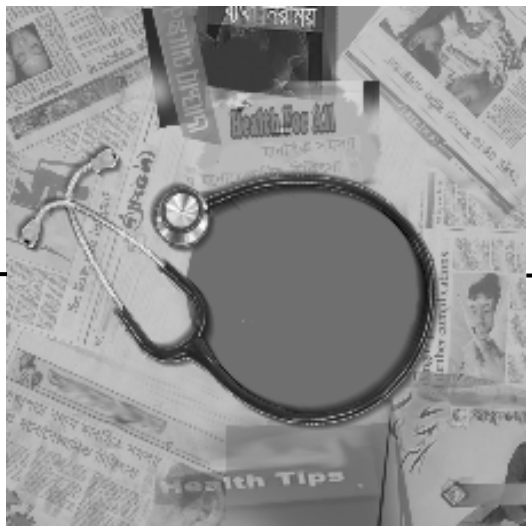

সংবাদের একটি সংজ্ঞা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। গণযোগাযোগ তাত্ত্বিক Mithchell V. Charnley ও Blair Charnley 'Reporting (Fourth Edition-1979)' বইয়ে সংবাদের একটি কার্যকর সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তাতে তারা বলেছেন, 'News the timely report of facts of interest or importance.' স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিকতায় এই দুই বিষয়– Interest ও Importance খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষের স্বার্থ বা সংশ্লিষ্টতা যেমন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত আবার নানা প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্বও অসীম। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ দুই বিষয়ের সংবেদনশীলতাও খুব বেশি।

কেস স্টাডিঃ ১

'ভ্যাকসিন হিরো সম্মাননায় ভূষিত শেখ হাসিনা' (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। স্বাস্থ্যবিষয়ক এই সংবাদটি দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যেমন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ বা সংশ্লিষ্টতার (Interest) বিষয় আছে আবার এর গুরুত্বও (Importance) অসীম। যে সংবাদের সারকথা ছিল– 'বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভ্যাকসিন হিরো সম্মাননায় ভূষিত করেছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন জিএভিআই বোর্ডের চেয়ার নগচি ওকোনজো আইয়েলা।

কেস স্টাডিঃ ২

'বাংলাদেশে ওয়েস্ট নাইল নামের নতুন ভাইরাস এসেছে।' (প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। প্রত্যেক নাগরিকের জনস্বাস্থ্যের জন্য এই খবরটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রভাবগত গুরুত্বও (Importance) অসীম, যা সংবাদের সংজ্ঞার সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। যে সংবাদের সারকথা হলো: 'দেশে নতুন একটি ভাইরাস এসেছে। কোথা থেকে এই ভাইরাস এসেছে, সরকারি তরফ থেকে তার অনুসন্ধান এখনো শুরু হয়নি। কতজন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত, তা-ও জানা যায়নি। ভাইরাসের নাম 'ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস'। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞানী, গবেষক ও

কর্মকর্তারা বলেছেন, ভাইরাসটি বাংলাদেশে নতুন। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) একজন ব্যক্তির শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত করেছে। সপ্তাহদেড়েক আগে আইসিডিডিআরবি এই তথ্য লিখিতভাবে সরকারের অন্তত তিনটি দপ্তরকে জানিয়েছে বলে সরকারি সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। তবে আইসিডিডিআরবি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনো তথ্য বা বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ... বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস সাধারণত কাকজাতীয় পাখির শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই ভাইরাসে সংক্রমিত মশা কামড়ালে মানুষ আক্রান্ত হয়। ভাইরাসের কারণে স্নায়ুতন্ত্রের রোগে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

কেস স্টাডি-১ ও কেস স্টাডি-২ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে একজন মানুষের ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। কেস স্টাডি-১ থেকে সহজেই জানা যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়টি সামগ্রিক অর্থে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে বিষয়ে বৈশ্বিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। আর কেস স্টাডি-২ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে জনস্বাস্থ্যের নিত্যদিনের ঝুঁকির বিষয়টি আছে। যে বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে একজন প্রতিবেদককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। মাথায় রাখতে হয়েছে প্রতিবেদনটির ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টিও। আর এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে খুবই সতর্ক থাকতে হয় প্রতিবেদককে। মেনে চলতে হয় নানা নির্দেশনা।

এখন আমরা দেখতে পারি স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদের আওতায় কোনগুলো পড়ে:

* মৌসুমি রোগবালাই (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ডায়রিয়া, ফ্লু ইত্যাদি)।
* প্রতিদিনের স্বাস্থ্যসেবা (হাসপাতালগুলোর অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবার মান ইত্যাদি)
* রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া।
* রোগবালাই নিয়ে গবেষণা। (ট্রিম্যানখ্যাত আবুল বাজনদারসহ বিভিন্ন বিরল রোগের ঘটনাপ্রবাহ)
* ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা।
* মানসিক স্বাস্থ্য।
* গ্রাম্য ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রক্রিয়া।
* স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি-অনিয়ম।
* ভুল চিকিৎসা।

স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদনে Association of Health Care Journalists (AHCJ) নির্দেশনা

Association of Health Care Journalists প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক এই দাতব্য সংস্থার উদ্দেশ্য মেডিকেল বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জনসাধারণের সঙ্গে বোঝাপড়া (Understanding of health care issues) বাড়ানো। এই লক্ষ্যে সংস্থাটি সাংবাদিকতায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপস্থাপনসহ নানা বিষয়ে কাজ করে আসছে। সাংবাদিকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ে সাংবাদিকতার নির্দেশনাবলিও (Guidelines) তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে সংবেদনশীল এই বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে একজন সাংবাদিকের বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibility) রয়েছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিকতায় AHCJ-এর নির্দেশনাবলির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা ইয়াসির আরাফাত ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর। আরাফাতের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ও মৃত্যু নিয়ে সে সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল। ... যাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইয়াসির আরাফাতের স্বাস্থ্যের অবনতি ও তার শরীরে থাকা রাসায়নিকের মাত্রা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ছিল

১. রোগীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (Show Respect)

একজন পেশাদার প্রতিবেদক স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির সময় সংবেদনশীল হয়ে উচ্চ পেশাদার মান বজায় রাখবেন। আর এক্ষেত্রে রোগীর প্রতি সম্মান দেখানো খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিভিন্ন ধরনের যৌন ও মানসিক রোগকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। যেমন– একসময় বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীকে অভিশপ্ত রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রোগীসহ পরিবারকে করা হতো একঘরে। যদিও সে অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। এছাড়া বর্তমানে এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত রোগীকেও নানাভাবে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। সঙ্গে সিফিলিস, গনোরিয়াসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও অসম্মানের চোখে দেখা হয়। মনে রাখা জরুরি, একজন প্রতিবেদক কখনোই সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে কোনো রোগীর প্রতি বিরক্তি, অসম্মান বা নেতিবাচক মানসিকতা প্রকাশ করবেন না। প্রতিবেদকের কাজ হবে কোনো ধরনের মানসিক চাপ তৈরি না করে যথাযথ সম্মান বজায় রেখে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা নির্দিষ্ট মানদণ্ড বজায় রেখে প্রকাশ করা। একই সঙ্গে মানসিক রোগীদের নিয়ে প্রতিবেদন তৈরিতেও একজন সাংবাদিক বিশেষ ভূমিকা রাখবেন। কোনো অবস্থাতেই রোগীকে বিরক্ত করবেন না।

২. সংবাদসূত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা (Be vigilant in selecting sources)

সংবাদের উৎস একজন প্রতিবেদকের কাজে বড়ো সম্পদ। এই সংবাদসূত্রের মাধ্যমেই একজন প্রতিবেদক সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি সাদামাটা বা নীরস (Dull Day) দিনে একান্ত প্রতিবেদন (Exclusive) তৈরি করতে সক্ষম হন (রায়, সুধাংশু), যা ওইদিন সংবাদমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে ওই প্রতিবেদককে তার সংবাদসূত্র সম্পর্কে অধিক সতর্ক থাকতে হয়। যাতে কোনো তথ্য-উপাত্ত ভুলভাবে প্রকাশিত না হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে অবশ্যই খুবই সতর্ক থাকতে হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে লেখার জন্য একজন প্রতিবেদক কোন চিকিৎসক বা সোর্সকে সংবাদের উৎস হিসেবে ব্যবহার করবেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক পরিভাষা বা মেডিকেল টার্ম থাকতে পারে, যা ওই সোর্স তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে। এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ে সাংবাদিকতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা। এ বিষয়ে প্রতিবেদক অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

৩. অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য যোগসূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা (Investigate and report possible links)

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা ইয়াসির আরাফাত ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর। আরাফাতের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ও মৃত্যু নিয়ে সে সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল। যার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক সংবাদভিত্তিক টিভি চ্যানেল আলজাজিরা অনুসন্ধান শুরু করেছিল। চ্যানেলটি ২০১২ সালের ৪ জুলাই What Killed Arafat? নামের একটি অনুসন্ধানী তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে। যাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইয়াসির আরাফাতের স্বাস্থ্যের অবনতি ও তার শরীরে থাকা রাসায়নিকের মাত্রা নিয়ে

চুলচেরা বিশ্লেষণ ছিল। বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায় মৃত্যুর সময় আরাফাতের শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে পলোনিয়ামের (একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান) উপস্থিতি ছিল, যা নিয়ে ওই সময় ভীষণ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এই অনুসন্ধানে আলজাজিরা দুটি (Institute of Radiation Physics and University of Lausanne of Switzerland) গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত গবেষণাকে মূল তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এই অনুসন্ধানের পর আরাফাতের স্ত্রী সুহা আরাফাত নতুন করে তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের দাবি জানান। যার ভিত্তিতে মাহমুদ আব্বাসের ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ আরাফাতের মৃতদেহ উত্তোলন করে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী ২০১২ সালের ১২ নভেম্বর সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের তিনটি গবেষক দল আরাফাতের মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। সুইজারল্যান্ডের গবেষকরা যে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন তাতে তারা আরাফাতের হাড়ে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৮% বেশি পলোনিয়ামের অস্তিত্ব পান (আলজাজিরা)। যার ভিত্তিতে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। এই আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে, কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একজন স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিক নানা বিষয়ে খোঁজখবর রাখবেন। যার ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে অসাধারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

৪. চিকিৎসাশাস্ত্র গবেষণা সম্পর্কে জানা (Understand the process of medical research)

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। বর্তমান বিশ্বে গবেষণা চলছে প্রাণসংহারী ইবোলা ও এইচআইভি/এইডসের টিকা আবিষ্কার নিয়ে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরাই নানাবিধ গবেষণায় যুক্ত আছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর সব চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণাতেই বিভিন্ন স্তর থাকে। আর গবেষণায় ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের প্রাণী। তাই একজন প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। প্রথম স্তরের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিবেদক কোনো সিদ্ধান্তে আসবেন না। গবেষণা শেষ হওয়ার পর সে বিষয়ে অন্য গবেষকদের অনুমোদনের পর সেই বিষয়ে প্রতিবেদক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। প্রাথমিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

৫. তথ্য ও ছবি সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় কারও ক্ষতি না করা (Recognize that gathering and reporting information may cause harm)

একজন প্রতিবেদককে কাজ করতে হয় হাসপাতালে, অনেক সময় দুর্গত এলাকায়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ধরনের স্থানে কাজ করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই রোগীর চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি করা যাবে না। জেনে রাখা ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় সকালের সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়েই চিকিৎসকরা রাউন্ডে আসেন, নির্ধারণ করেন নতুন ওষুধ ও পথ্য। তাই প্রতিবেদন তৈরির কাজে এ সময়ে ওয়ার্ডে বা হাসপাতালের কোনো স্থানে ভিড় না করাই ভালো। এতে রোগীদের বিরক্তির উদ্রেগ হতে পারে। যেমন– সম্প্রতি ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ ছিল ভয়াবহ। রাজধানী ঢাকার বেশির ভাগ হাসপাতাল ছিল রোগীতে পরিপূর্ণ। গণমাধ্যমের মনোযোগ ছিল হাসপাতালগুলোয়। কিন্তু লাইভ বা গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে অনেক সময় অনেক প্রতিবেদক ওয়ার্ডে এমনভাবে কাজ করেছেন, যা স্বাভাবিক চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

৬. অস্পষ্ট ও স্পর্শকাতর ভাষা ব্যবহার না করা (Avoid vague, sensational language)

আবারও উল্লেখ করতে হয়, স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদিকতা খুবই সংবেদনশীল। তাই এক্ষেত্রে অস্পষ্ট, ভাসাভাসা, আবছা কোনো বিষয় প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। একই সঙ্গে আবার কোনো বিষয়কে অতিরঞ্জিত করারও কোনো সুযোগ নেই। অবশ্যই পরিহার করতে হবে স্পর্শকাতর শব্দ ও ভাষা। বাংলাদেশে সাধারণত অনেকে ক্ষেত্রেই মহামারি, ভয়াবহ রূপ, আতঙ্ক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন– মহামারি রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু, দেশজুড়ে চিকুনগুনিয়া আতঙ্ক, ভয়াবহভাবে ছড়াচ্ছে ক্যান্সার ইত্যাদি শিরোনাম দেখা যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরনের শব্দ বা শিরোনাম ব্যবহার খুবই যৌক্তিক হতে পারে; কিন্তু পরিস্থিতি ততটা জটিল বা গুরুতর না হলে এই ধরনের শব্দ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। মোদ্দাকথা, চাঞ্চল্য তৈরি করা যাবে না।

৭. প্রতিবেদন তৈরি ও সপক্ষতার (ওকালতি) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় (Distinguish between advocacy and reporting)

যে কোনো ধরনের সাংবাদিকতায়ই সপক্ষতা (Advocacy) অবলম্বন নিষিদ্ধ। এতে প্রতিবেদনের মান ক্ষুণ্ন হয়। লঙ্ঘিত হয় নিরপেক্ষতা। মনে রাখা প্রয়োজন, সারা বিশ্বেই মেডিকেলবিষয়ক মার্কেটিং খুবই প্রকট। একটা ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে সপক্ষতা (Advocacy) অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধি প্রতিবেদককে অনৈতিক সুবিধার (Kickbacks) প্রস্তাব দিতে পারে। প্রতিবেদককে অবশ্যই তা পরিহার করতে হবে। আবার একই সঙ্গে অবচেতন মনেও কোনোভাবে কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির সপক্ষতা নেওয়া যাবে না। একজন মেডিকেল প্রতিবেদক এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকবেন।

৮. ফাইল ছবি বা ভিডিও ফুটেজ ব্যবহারে সতর্কতা (Be judicious in the use of television library or file footage)

ধরা যাক, ২০১৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ কমে গেছে। একজন প্রতিবেদক ওই বছরের জুলাই-আগস্টের ডেঙ্গুর প্রকোপের ফলো-আপ স্টোরি হিসেবে একটা প্রতিবেদন তৈরি করছেন। তখন তিনি ব্যবহার করছেন সেই সময়ের ফাইল ফুটেজ। উল্লেখ্য, এই ফুটেজ ব্যবহার ওই সময় যথাযথ না-ও হতে পারে। আবার কোনো রোগী বা তার পরিবারের জন্য হতে পারে বিব্রতকর অথবা হতে পারে ভুল ব্যাখ্যা। উন্নত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে এই ধরনের ছবি ব্যবহারে বিশেষ নীতিমালা রয়েছে, যা অবশ্য অনুসরণ করতে হয়।

৯. মৌলিকত্ব বজায় রাখা (Be original)

বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে ভুয়া সংবাদের যুগ (Era of Fake news)। আর যে জন্য অপতথ্য, ভুল তথ্য তথা ভুয়া সংবাদ নিয়ে নানাবিধ আলোচনা চলছে বিশ্বজুড়ে। স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদ তৈরিতে মৌলিকত্ব বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবেদক অবশ্যই মূল ও মৌলিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করবেন। এখানে কোনো অবস্থাতেই কল্পিত তথ্য ব্যবহারের সুযোগ নেই।

তথ্যসূত্র

১. Charnley, Mithchell V. and ও Charnley, Blair, 'Reporting, 1979, Fourth Edition, Newyork: Holt, Rinehart and Winston.
২. বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।
৩. প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।
৪. https://healthjournalism.org/principles
৫. Kamath.MV, 1980, Professional Journalism, India: Vikash Publishing House PTT Ltd.
৬. কিবরিয়া, গোলাম। (১৯৯১)। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত সাংবাদিকতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৭. Keir, Gerry, Maxwell, McCombs, Donald, L Show, 1986, Advanced Reporting Beyond News Event. Longman: New York & London.
৮. Moore, Roy L. Murry. Michel D., 2012, Media Law and Ethics, New York & London: Routledge Taylor & Franchis group.
৯. Sharma C, Dinesh, 2007, Development Journalism An Introduction, Manila: The Ateneo de Manila University.

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ই-বর্জ্য
স্বাস্থ্য ও
গণমাধ্যম

শুভ কর্মকার

আহমদ ছফা প্রকৃতিকে ভালোবেসে লিখেছেন, 'এই পুষ্প, এই বৃক্ষ, তরুলতা, এই বিহঙ্গ আমার জীবন এমন কানায় কানায় ভরিয়া তুলেছে, আমার মধ্যে কোনো একাকিত্ব– কোনো বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারি না।' শুধু আহমদ ছফা নন, প্রকৃতিকে অনুভব করেন না, ভালোবাসেন না– এমন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া দুরূহ। কিন্তু এই প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মতো মানুষের কারণেই। মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের কারণে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে উঠছে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা।' এই বিনাশের মূল ক্রীড়নক পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন উপাদান। উপাদানগুলো পরিবেশকে বিনষ্ট করে আসছে। এর মধ্যে নতুন যোগ হওয়া উপাদান ই-বর্জ্য। তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিশ্বায়নের যুগে টেলিভিশন, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনবিহীন পৃথিবী কল্পনা করা যায় না। এ ছাড়াও অডিও প্লেয়ার, ডিভিডি প্লেয়ার, ওয়্যারলেস ডিভাইস, মেডিকেল ও ডেন্টাল যন্ত্রপাতি আজ জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ। এসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশবিহীন জীবন আজ কল্পনাতীত। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশের পরিমাণ। এসব পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ যত্রতত্র নিক্ষেপণে এক নতুন ধরনের আবর্জনা তৈরি করছে, যা আমাদের কাছে ই-বর্জ্য নামে পরিচিত। এখন এই ই-বর্জ্য পরিবেশ এবং মানবসমাজের জন্য অন্যতম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুমকি সত্ত্বেও এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যমের তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে ই-বর্জ্যে স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ই-বর্জ্য

ইলেকট্রনিক-সামগ্রীর ব্যবহার শেষে তার পরিত্যক্ত অংশই ই-বর্জ্য। ই-বর্জ্যকে ইওএল (এন্ড অব লাইফ) পণ্য নামে ডাকা হয়ে থকে। একটি পণ্যের ব্যবহার শেষে তার ধ্বংসাবশেষই হলো ইওএল। আর এ ধরনের পণ্যকে ইওএল পণ্য বলা হয়। ই-বর্জ্য সম্পর্কে Grunberger and Mark-Berglund তাদের Statistics on Waste Electrical and Electronic Equipment (2003) গ্রন্থে বলেছেন, 'Electrical or electronic equipment which is waste including all components, sub-assemblies and consumables, which are part of the product at the time of discarding.' আবার Hester and Harrison ২০০৮

সালে তাদের Electronic Waste Management গ্রন্থে বলেছেন, 'ই-বর্জ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে টেলিভিশন, কম্পিউটার, এলসিডি এবং প্লাজমা ডিসপ্লে, মোবাইল ফোন, সেই সঙ্গে ব্যাপক পরিমাণ গৃহস্থালি মেডিকেল এবং শিল্প যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতি ফেলে দেওয়া হয় নতুন যন্ত্রপাতির আগমনের কারণে। ফলে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য প্রতিবছর উৎপাদিত হয়। এই বর্জ্য ধারণ করে বিষাক্ত এবং কনসিনোজেনিক জটিলতা, যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।'

শাহরিয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরিচালিত গবেষণায় ই-বর্জ্য সম্পর্কে বলা হয়, 'Electronic Waste' (E-waste) may be defined as well secondary computers, entertainment device electronics, mobile phones, and other items such as television sets and refrigerators, whether sold, donated or discarded by their original owner.

সুতরাং ই-বর্জ্য হলো পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, যা পরিবেশে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি করে থাকে।

ই-বর্জ্যের উপাদান

ই-বর্জ্যের উপাদান বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেসব পণ্যকে, যেখান থেকে ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এসব পণ্যকে ১০টি ধরনে বিভক্ত করেন Zhang and Krumdick। নিম্নে এই ধরনগুলো দেওয়া হলো:

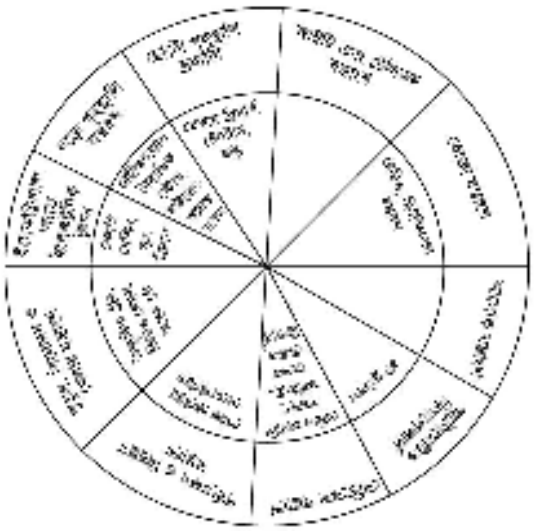

সূত্র: Zhang and Krumdick, 2011, P. 25

এ ছাড়াও তারা আরেকটি উপাদান গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্পের কথা বলেন। Grunberger and Mark-Berglund ই-বর্জ্যের উপাদান সম্পর্কে বলেন, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ– সেটা হতে পারে ছোটো-বড়ো গৃহস্থালির, বাগানের, পেশাগত, তথ্যপ্রযুক্তির, আলোকের, ভোক্তা যন্ত্রাংশের।

শাহরিয়ার এবং অন্যরা ই-বর্জ্যের উপাদানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, টেলিভিশন ও কম্পিউটার মনিটর, কম্পিউটার ও এর অন্যান্য যন্ত্রাংশ, অডিও ও স্টেরিও যন্ত্রাংশ, ভিসিআর, ডিভিডি প্লেয়ার, সিএফএল বাল্ব, ভিডিও ক্যামেরা, টেলিফোন, সেলুলার ফোন, বিভিন্ন ওয়্যারলেস যন্ত্রাংশ, ফ্যাক্স, কপি মেশিন, ভিডিও গেমস, মেডিকেল এবং ডেন্টাল যন্ত্রাংশ।

ই-বর্জ্যের নিঃসারিত মৌল ধাতু বা পদার্থ

ই-বর্জ্যের মাধ্যমে যেসব পদার্থ নিঃসারিত হয়, সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ক্ষতিকারক পদার্থ ও অক্ষতিকর পদার্থ।

ক. ক্ষতিকারক পদার্থ: উপরে আলোচিত উপাদান থেকে সৃষ্ট বর্জ্যে এই ধাতুগুলো নিঃসারিত হয়। যেমন– মার্কারি, লিড, ক্যাডমিয়াম, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম। এছাড়া আরও কিছু পদার্থ ই-বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন– পারদ, সালফার, সিসা, বেরিলিয়াম অক্সাইড, অ্যামেরিসিয়াম ইত্যাদি। এখন দেখা যাক, এই পদার্থগুলো কোন ধরনের যন্ত্রাংশ থেকে নিঃসারিত হয়:

অ্যামেরিসিয়াম: স্মোক অ্যালার্ম নামক যন্ত্রাংশের মধ্যে থাকে।

মার্কারি: ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব, ফ্ল্যাট স্ক্রিন মনিটর।

সালফার: লেড-এসিড ব্যাটারি।

বিএফআরএস: বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত প্লাস্টিকে এই উপাদান থাকে।

ক্যাডমিয়াম: লাইট-সেনসিটিভ রেজিস্ট্রার, নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি, নিকেল-ক্যাডমিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারি। নিকেল-ক্যাডমিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারিতে ৭-১৮% ক্যাডমিয়াম থাকে।

লেড: সিআরটি মনিটর গ্লাস, লেড-এসিড ব্যাটারি।

বেরিলিয়াম অক্সাইড: সিপিইউতে ব্যবহৃত থার্মাল গ্রিজে থাকে, পাওয়ার ট্রানজিস্ট, এক্সরে যন্ত্র।

খ. অক্ষতিকর পদার্থ: ই-বর্জ্যে অনেক পদার্থ আছে যেগুলো সমাজ ও মানবদেহের কোনো ক্ষতি করে না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিন, কপার, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, সিলিকন, নিকেল, লিথিয়াম, সোনা ইত্যাদি।

ই-বর্জ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

ই-বর্জ্য পরিবেশে যেসব পদার্থ বা ধাতু নিঃসারণ করে থাকে, সেসব পদার্থ বা ধাতু প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এগুলো মানবদেহ, প্রাণিকুল এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইএসডিও পরিচালিত গবেষণায় ই-বর্জ্যের নিম্নোক্ত ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরা হয়। যথা–

স্বাস্থ্য: ই-বর্জ্যের কারণে মানুষের নানা রকম রোগ হয় যেমন– ক্যান্সার, অ্যাজমা। এছাড়া মানুষের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়, শিশুমৃত্যু বেড়ে যায়, শোনার সমস্যা, দৃষ্টি সমস্যা এমনকি বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে। এখন দেখা যাক, ই-বর্জ্যে অবস্থানরত কোন উপাদান মানব শরীরের কী ধরনের ক্ষতি করে থাকে।

মার্কারি: মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে, মাসল দুর্বল করে দেয়।

সালফার: মানবদেহের ক্ষেত্রে লিভারের ক্ষতি করে, কিডনি নষ্ট করে, হার্ট নষ্ট করে, চোখেরও ক্ষতি করে।

বিএফআরএস: এটি মানব শরীরের নার্ভ সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর, থাইরয়েড এবং লিভারেও এটি সমস্যা তৈরি করে।

ক্যাডমিয়াম: এটি মানব শরীরের ফুসফুস ও কিডনির জন্য ক্ষতিকর।

এছাড়া আলী বলেন, পারদ প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব, বামনত্ব ও মৃত্যুর কারণ। সিসা, লিথিয়াম, আর্সেনাইটের মতো বিষাক্ত দ্রব্যগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের অনেক পদার্থই মানুষের স্নায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। কম্পিউটারের বডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বোমিনেটেড ফ্রেম রিটারডেন্ট প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক মানবদেহ গঠনের অন্যতম উপাদান ডিএনএ ধ্বংস করে।

পরিবেশ: পরিবেশের সঙ্গে ই-বর্জ্যের সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ। মানুষের মতো পরিবেশও ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, জমির উর্বরতা নষ্ট এবং পুরো পরিবেশ বন্যপ্রাণীর জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশের ক্ষতিসাধন পরোক্ষভাবে মানব শরীরের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে। ই-বর্জ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক থাকে। এসব প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের উদ্দেশ্যে পোড়ানো হলে এটি পরিবেশে বায়ুদূষণ করে থাকে। এই পোড়ানোর ফলে বায়ুতে নিসৃত হয় Carcinogens, Neurotoxins. ই-বর্জ্যে বিদ্যমান উপাদান পরিবেশের জন্য যে ধরনের ক্ষতি করে থাকে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো:

মার্কারি: অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ এবং জমির উর্বরতা নষ্ট করে।

সালফার: সালফিউরিক এসিড নির্গমন হওয়ার কারণে চাষাবাদে ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

বিএফআরএস: প্রাণীর জন্য এটা ক্ষতিকর।

ক্যাডমিয়াম: মাটির বাস্তুসংস্থানে আঘাত করে।

এছাড়া আলী বলেন, 'পারদ পরিবেশকে ধ্বংস করে।' ই-বর্জ্য শুধু নিক্ষেপই নয়, এর রিসাইক্লিং প্রক্রিয়াও মানবদেহ ও সমাজের ক্ষতি করে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নারী, পুরুষ ও শিশু। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে সাতজনই তাদের শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় সিসা নিয়ে জীবনধারণ করছে।

বাংলাদেশ ও ই-বর্জ্য

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে, তা একদিকে যেমন উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, অপরদিকে ই-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়ছে। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এক যৌথ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ বছরে ভারতে ই-বর্জ্যের পরিমাণ ৫০০ গুণ বাড়বে। এ প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বাংলাদেশেও ই-বর্জ্যের পরিমাণ ১০ বছরে ২০০ গুণ বাড়বে।

ক. বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের পরিমাণ: বাংলাদেশে যে পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয়, সে সম্পর্কে একটি গবেষণা পরিচালনা করে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। তাদের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২.৮১ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। যার বণ্টন এরকম:–

যে ধরনের দ্রব্য থেকে উৎপাদিত হচ্ছে	বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ
জাহাজভাঙা শিল্প	২.৫ মিলিয়ন টন
টেলিভিশন সেট	০.১৭ মিলিয়ন টন
কম্পিউটার	০.০৩৫ মিলিয়ন টন
মোবাইল ফোনসেট	০.০০৫ মিলিয়ন টন
সিএফএল বাল্ব	০.০০০৫ মিলিয়ন টন
মার্কারি বাল্ব	০.০০১ মিলিয়ন টন
থার্মোমিটার	০.০০৯ মিলিয়ন টন

সূত্র: Shahriar et al, 2010

খ. বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব: বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, সে সম্পর্কে ইএসডিও এক গবেষণা পরিচালনা করে। সেখানে বাংলাদেশের নিম্নোক্ত ক্ষতিকর বিষয় তুলে ধরা হয়। যথা:

১. **পরিবেশ:** সঠিক পরিমাপ ছাড়া ই-বর্জ্যের অপসারণ পরিবেশের ক্ষতি করে। সচেতনতার অভাব এবং তথ্যের সহজলভ্যতার অভাবে ই-বর্জ্যের পুনঃচক্রায়ণের সময় মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ই-বর্জ্য মাটির উপাদানের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটি আমাদের শস্যজমির উৎপাদনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অবৈধভাবে ই-বর্জ্য অপসারণের কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ই-বর্জ্য অপসারণের জন্য বাংলাদেশে কোনো আইন নেই এবং বৈদ্যুতিক পণ্য অপসারণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। নদীমাতৃক বাংলাদেশ হওয়ায় ই-বর্জ্যের অনেকাংশই নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে এর রাসায়নিক উপাদান নদীর পানিকে দূষিত করে।

২. **স্বাস্থ্য:** ইএসডিওর গবেষণায় আরও দেখানো হয়, ই-বর্জ্যের বিভিন্ন উপাদান মানব শরীরে বিভিন্ন রোগ তৈরি করে থাকে। এর মধ্যে তারা উল্লেখ করেন– মার্কারির কারণে ব্রেন ডিজঅর্ডার, কিডনি, রেনাল এবং নিউরোলজিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ততা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার লিডের কারণে শারীরিক অক্ষমতা, মেন্টাল রিটারডেশন, আচরণগত সমস্যা, শোনার সমস্যা। ক্যাডমিয়ামের কারণে যকৃত নষ্ট হয়ে যায়, হাড়ের ভঙ্গুরতা, উচ্চরক্তচাপ, নার্ভ ও ব্রেনে ক্ষতি, কিডনি ও যকৃতে সমস্যা তৈরি হয়। শাহরিয়ার এবং প্রমুখ পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়:
   - বাংলাদেশে ১৫% শিশুশ্রমিক ই-বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের জন্য মারা যায়।
   - ৮৩% মানুষ অসুস্থ এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে।
   - ৫০ হাজার শিশু অনানুষ্ঠানিকভাবে ই-বর্জ্য সংগ্রহ এবং রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।
   - এর মধ্যে ৪০% শিশু শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কাজ করে।

ফলে এটা মানব শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি পরিবেশের জন্যও। একইভাবে এটি সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ লাভ করছে কোমলমতি শিশুদের ওপর। তাদের যে সময় পড়াশোনা করার কথা, তখন তারা শিশুশ্রমে যুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করছে। যার প্রভাব ওই শিশুদের ওপর নয় বরং এর প্রভাব পড়বে পুরো দেশের ওপর। তাই বাংলাদেশকে এখনই ই-বর্জ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

গ. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে থ্রি-আরের (3R) কোনো বিকল্প নেই। এই থ্রি-আর হলো রিডিউস, রিইউজ, ও রিসাইকেল। অর্থাৎ হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ। রিসাইক্লিংয়ের প্রথম কথা– পণ্য ব্যবহার যত হ্রাস করা যায়, তত ভালো। যদি না করা যায় তবে এটিকে পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। পুনর্ব্যবহারও না করা গেলে পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ করা।

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো সংগঠনই কাজ করে না। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্জ্য উৎপাদনকারীকেই উদ্যোগ হাতে নিতে হয়। এখন দেখা যাক, বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কী অবস্থা বিরাজ করছে;

টেলিভিশন: টেলিভিশন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে ই-বর্জ্য উৎপাদনের ৫০% নিয়ে নেয়, ৩০% জমিতে ফেলা হয়, ২০% স্টোররুমে রাখে। মেরামতকারীদের মধ্যে ৩০% পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে, ১৫% ফেলে দেয়, ৫% কোনো উত্তর দেয়নি। ক্রেতাদের মধ্যে ৪০% মেরামতকারীদের কাছে তাদের পুরোনো টিভি বিক্রি করে দেয়, ১০% ফেলে দেয় এবং ২০% পুনরায় ব্যবহারের জন্য মেরামত করে।

কম্পিউটার: নষ্ট হওয়ার পর যদি মেরামত করে এক বছর চালানো যায়, তবে বেশির ভাগ সময়ই তা মেরামত করে চালায়। ৬০% কম্পিউটার স্টোররুম কিংবা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। ৪০% মেরামতের জন্য পাঠানো হয় এবং ৫০% যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোন: ৭৩% মোবাইল ফোন মেরামতকারী স্টোররুমে ফেলে দেয়। ৪০% ভোক্তা যত্রতত্র এমনকি বাড়ির মধ্যেও ফেলে দেয়।

সিএফএল: সিএফএল বাল্বের বিষক্রিয়া সম্পর্কে অসচেতনতাবশত ৫০% ভোক্তা যত্রতত্র এই বর্জ্য অপসারণ করে।

মেডিকেল বর্জ্য: ৩০% ডাক্তার মেডিকেল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করেন। ৯০% ক্লিনিকই এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়। ৫০% ডেন্টিস্ট ই-বর্জ্য স্টোরে নিক্ষেপ করে।

ই-বর্জ্য ও গণমাধ্যম

বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের এরকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও গণমাধ্যমকে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। বেশকিছু দূষণবিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হলেও ই-বর্জ্য ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক দিক এবং এ সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরিতে সংবাদ বা ফিচার প্রকাশিত-প্রচারিত খুব কমই হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে ই-বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের হার সারা বিশ্বেই নাটকীয়ভাবে বাড়ানো সম্ভব, সেকারণেই সিঙ্গাপুরে বেশকিছু স্কুলে পাঠ্যসূচিতে রিসাইক্লিং সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গণমাধ্যম যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারে, তার প্রমাণ আগেও রয়েছে। বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় মূলত রাসেল কারসনসের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' নামক বইটি প্রকাশ হলে। তিনি বইটির মাধ্যমে জানান দেন কীটনাশক ব্যবহারের কারণে বিশ্বে পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি বইটির মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেন এবং পরিবেশ নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পকারখানার বাধা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। বইটি লেখার পর থেকে সমাজের সামনে এ প্রশ্নগুলো আসতে থাকে এবং সমাজ, গণমাধ্যম ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বার্জেস ও গোল্ড গণমাধ্যম এবং সংস্কৃতিকে পরিবেশগত ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক রচিত হওয়ার মধ্যে দিয়েই গণমাধ্যম সচেতনতা সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় বর্জ্য ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলাপ করলেও গণমাধ্যম ও সমাজ অনেক সময়ই তেমন গুরুত্ব প্রকাশ করত না। মূলত দ্রুতলয়ে দূষণ এবং ধীরলয়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ঘটার কারণে গণমাধ্যম তেমন গুরুত্ব দিত না। এর চেয়ে দ্রুত বিস্তারলাভকারী সংক্রামক রোগের প্রভাব নিয়েই বেশি সংবাদ প্রকাশিত হতো। গণমাধ্যমে যে বিষয়টি বেশি প্রচার করা হয়, সে সম্পর্কে মানুষ বেশি

সচেতন হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীদের একশবার বলা, গণমাধ্যমে একবার বলার সমান।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীরা আফ্রিকার পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিলেও আফ্রিকানরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিত না। ১৯৭০ সালে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে আফ্রিকানরা নানা উদ্যোগ হাতে নিলেও বিজ্ঞানীদের কোনো মতামতকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৮০ সালের দিকে যখন আফ্রিকান গণমাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু হলো, তখন রাতারাতি সেটা সারা পৃথিবীরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ঠিক একইভাবে পারদ দূষণ সম্পর্কে মানুষ তখনই সজাগ হলো, যখন এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচার করা হলো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার, পরিবেশ বিষয়ে গণমাধ্যম কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ই-বর্জ্যের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করছে না। তাই এ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে জনসচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যমকে দ্রুত ও ব্যাপক প্রচারে অংশ নিতে হবে। তবে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় নিম্নোক্ত বিষয়ে সংবাদ ও ফিচার তৈরি করতে পারে।

- বাংলাদেশের ই-বর্জ্যের পরিমাণ নিয়ে সংবাদ
- অব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্যগুলো ই-বর্জ্য, এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা
- ই-বর্জ্য স্বাস্থ্যের যে ধরনের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ
- ই-বর্জ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ
- ই-বর্জ্য ও এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধে সরকারের পদক্ষেপ সংক্রান্ত সংবাদ
- ই-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সংবাদ
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংবাদ
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ ইত্যাদি।

বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ এখন সবার হাতের নাগালে। এসব যন্ত্রাংশের ব্যবহার যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর পরিত্যক্ত হওয়ার সংখ্যাও। কিন্তু নেই কোনো অপসারণ ব্যবস্থা। আবার অনেকে জানেই না অব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের যত্রতত্র নিক্ষেপণ পরিবেশকে ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। কিন্তু এর পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে সহজেই মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে সম্ভব হচ্ছে না কিছুই। তাছাড়া যথাযথ আইন না থাকা এবং যে আইন আছে তার যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় পরিবেশের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমকেও নিতে হবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

তথ্যসূত্র

১. আলী, কে এম কামরান (২০১২)। 'ই-বর্জ্য: পুনচক্রায়ণ ও জনসচেতনতা জরুরি'। দৈনিক ইত্তেফাক। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২। ঢাকা: বাংলাদেশ।

২. রহমান, শফিকুর (২০১২)। 'এশিয়ার রিসাইক্লিং চ্যালেঞ্জ'। *সাপ্তাহিক ২০০০*। ১২ অক্টোবর ২০১২, সংখ্যা- ২১, পৃ. ৪২-৪৩।

৩. সিদ্দিকী, ফয়জুল (২০১১)। 'ই-বর্জ্য: হুমকির মুখে বাংলাদেশ'। সাপ্তাহিক ২০০০। ৩০ ডিসেম্বর ২০১১, সংখ্যা-৩৩, পৃ. ২৬।

৪. Boykoff, Maxwell T. and Smith, Joe (2010). Media Presentatios of Climate Change. Retrieved From: www.sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_Files/2010.31.Pdf, on 20 January 2011.

৫. Burgess, J.A. and Gold, J.A. (eds.) (1985). Geography, The Media and Popular Culture. London: Croom Helm.

৬. Carson, R. (1962). Silent Spring. New York: Houghton Miffin.

৭. Grunberger, Jan and Mark-Berglund, Tiinan (2003). Statistics on Waste Electrical and Electronic Equipment. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

৮. Hester, R. E. and Harrison, R. M. (2008). Electronic Waste Management.

৯. Zhang, Lifeng and Krumdick, Gregory K. (2011) (Edited). Recycling of Electronic Waste ??. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

১০. 'Electronic Waste'. Retrieved From: www.en.wikipedia.org/Electronic_Waste, on 20 August 2012.

লেখক: প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

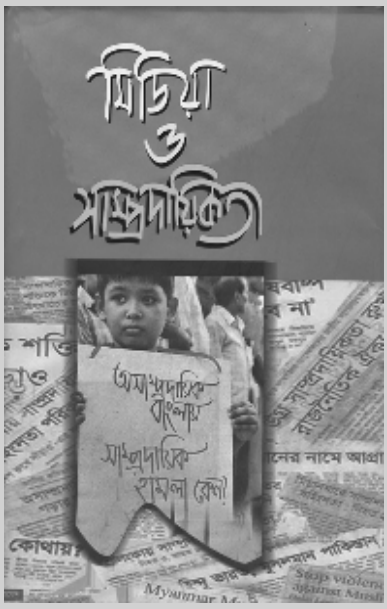

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ

ডা. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান খান

ভূমিকা

যে কোনো আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Gupta and Sinha, 2010)। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব অপরিসীম। গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবহার ও ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে (Leask, Hooker and King, 2010)। গণমাধ্যম দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র আমাদের দেশের মানুষের মাঝে সহজে পৌঁছে যায়। সংবাদপত্র আমাদের মনোযোগকে বিভিন্ন ইস্যুর দিকে ধাবিত করে (Gupta and Sinha, 2010)। সংবাদপত্র প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে। অনেকেই গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের জন্য সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল। নীতিনির্ধারকরাও সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন (Freimuth, Greenberg, DeWitt and Romano, 1984)। সংবাদপত্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুগুলো সাধারণ জনগণ এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে (Bryant and Thompson, 2002)।

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা তার নিজের ও পরিবারের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান বা চিকিৎসা বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ সাধারণত গণমাধ্যম থেকেই বেশির ভাগ তথ্য ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি, মতামত তৈরি ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য ওই বিষয়ের গুণগত মানসম্পন্ন যথেষ্ট উপাদান সংবাদপত্রে থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিপর্যায়ে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিপর্যায়ে, পরিবার ও সমাজে সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে এর শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে (Robert and Yeo, 2011)।

গবেষক, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক খবর ও তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে থাকেন। যে কোনো বিষয়ে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং মানুষের মনে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ধারণা সৃষ্টির জন্য সে বিষয়ে গণমাধ্যম কাভারেজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (Robert and Yeo, 2011)।

বিজ্ঞানীরা সফলভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে প্রথমে অবশ্যই তাদেরকে গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে (Science Media Centre, 2002)। চিকিৎসা একটি মহান পেশা। চিকিৎসক প্রতিনিয়ত রোগীর রোগ সারাতে বা জীবন বাঁচাতে সচেষ্ট থাকেন। চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমের বেশি বেশি কাভারেজ প্রত্যাশা করেন। কারণ এতে সাধারণ মানুষের অসুখ-বিসুখ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ফলাফল বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং বাস্তবসম্মত ধারণার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুল ধারণা বা কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এছাড়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্যও তারা সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত কাভারেজ প্রত্যাশা করে থাকেন (Robert and Yeo, 2011)।

সাংবাদিকতা একটি বহুমাত্রিক সামাজিক দায়িত্বশীল মহৎ পেশা। মানুষের তথ্য জানার অধিকার এবং গণমাধ্যমে তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সামাজিক অঙ্গীকার নিয়ে সাংবাদিকতা রাষ্ট্র, সমাজ তথা মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে আসছে (রহমান, ২০১৭)। সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীও জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যাদি, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে ভালোবাসেন। জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে সাংবাদিক স্বাস্থ্যঝুঁকি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দুর্বল দিক এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি হয়ে থাকলে তা-ও জনসম্মুখে প্রকাশ করে থাকেন (Robert and Yeo, 2011)।

সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হচ্ছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমগুলোকে এ গবেষণাটির বিষয়বস্তু করা হয়েছে

গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাৎক্ষণিক অথবা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের ভেতর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৬)। আধুনিক যুগে সংবাদমাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম এক হাতিয়ার। মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলো প্রতিনিয়ত মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, রাজনীতি, বিনোদন, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে আসছে (রায়, ২০১৮)। সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হচ্ছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমগুলোকে এ গবেষণাটির বিষয়বস্তু করা হয়েছে। আমাদের দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক খবর ও অন্যান্য ইস্যুকে কতটা গুরুত্বসহকারে কীভাবে প্রকাশ করে থাকে, তা জানা এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমগুলোর পরিমাণগত ও গুণগত মানকে এ গবেষণার মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

যদিও সংবাদমাধ্যমের প্রকৃতি, ধরন ও পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, সমাজে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবসময়ই অক্ষুণ্ন রয়েছে (Kaiser Family Foundation and Pew Research Center, 2008)। জনগণ সবসময় সংবাদমাধ্যমের কাছে সময়োপযোগী, সঠিক, প্রাসঙ্গিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ বা তথ্যের প্রত্যাশা করে। তারা গণমাধ্যমকে তথ্যপ্রাপ্তির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করে এবং তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করে থাকে। একইভাবে জনগণ সংবাদমাধ্যম থেকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্য প্রত্যাশা করে। জনগণ এবং জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত সবাই সংবাদপত্রকে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যতথ্য পৌঁছানোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন (Gupta and Sinha, 2010)। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো জনগণের কাছে স্বাস্থ্যতথ্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে অন্যতম প্রিয় ও সহজলভ্য একটি গণমাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। জীবন ও জীবিকার জন্য প্রতিটি মানুষেরই সুস্বাস্থ্য কাম্য। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যু নিয়ে বিদেশে অনেক গবেষণা হয়ে থাকলেও আমাদের দেশে এ নিয়ে গবেষণা তেমন একটা চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোকে এ গবেষণাটির বিষয়বস্তু করা হয়েছে। আমাদের দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক খবর এবং অন্যান্য আইটেমকে কতটা গুরুত্বসহকারে কীভাবে প্রকাশ করে থাকে, তা অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমগুলোর পরিমাণগত ও গুণগত মানকে এ গবেষণার মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল সাংবাদিককে জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমগুলোকে আরও বেশি মানসম্মতভাবে এবং বেশি পরিমাণে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে। চিকিৎসককে চিকিৎসাবিষয়ক লেখায় উৎসাহিত করবে। এ গবেষণাটির ফলাফল নীতিনির্ধারকদেরকে মানসম্মত সাংবাদিকতা ও চিকিৎসা সাংবাদিকতা (Medical Journalism) বিষয়ে ইতিবাচক ও সময়োপযোগী যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে দিকনির্দেশনা দেবে। এ ছাড়াও গণমাধ্যম নিয়ে যারা ভবিষ্যতে গবেষণা করতে চান তাদের জন্যও এ গবেষণাটি সহায়ক হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক খবর এবং অন্য আইটেমগুলোকে কতটা গুরুত্বসহকারে, কত মাত্রায়, কীভাবে প্রকাশ করে থাকে, তা অনুসন্ধান করাই ছিল এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে:

১. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক কী কী ইস্যু কাভারেজ পাচ্ছে, তা খুঁজে বের করা।
২. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো কী পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে, তা বের করা।
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য ইস্যুর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর পরিমাণগত অনুপাত বের করা।
৪. সংবাদ, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন, কলামসহ কী কী ফরম্যাটে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, তা বের করা।
৫. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো সংবাদপত্রে কতটা গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হচ্ছে, তা উদ্‌ঘাটন করা।
৬. প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোয় ছবি এবং রং ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা নির্ণয় করা।
৭. প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর গুণগত মান যাচাই করা।
৮. বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা।
৯. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর কাভারেজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সংবাদপত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি শনাক্ত করে সংবাদপত্রের জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা।

গবেষণায় নিহিত প্রশ্নসমূহ

গবেষণাটি উল্লিখিত প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে:

১. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা কেমন?
২. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক কোন ইস্যুগুলো বেশি কাভারেজ পাচ্ছে?
৩. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো কী পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে?
৪. সংবাদ, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন, কলামসহ কী কী ফরম্যাটে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো প্রকাশিত হয়?
৫. সাংবাদিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোকে কতটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন?
৬. চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর গুণগত মান কেমন?
৭. বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর উপস্থাপনের ভিন্নতা কতটুকু?
৮. সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর কাভারেজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা কী ধারণা পোষণ করেন?

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার ধরন (Study design)

এই গবেষণাকর্মের তথ্য উৎপাদনের জন্য দুটি পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে– আধেয় বিশ্লেষণ এবং ইন ডেপথ সাক্ষাৎকার। আধেয় বিশ্লেষণ সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। Content analysis is a method of studying and analysing communication in a systematic, objective and quantitative manner for the purpose of measuring variables (Kerlinger, 1973). এ গবেষণায় সংবাদপত্রের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক উপাদানগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক– দুই ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয়ে থাকে (Wimmer and Dominick, 1987)। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে এ গবেষণাটিতেও পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের তথ্য উৎপাদনের জন্য দুটি পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে– আধেয় বিশ্লেষণ এবং ইন ডেপথ সাক্ষাৎকার। আধেয় বিশ্লেষণ সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ও জনপ্রিয় পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের যে কটি পদ্ধতি রয়েছে, সাক্ষাৎকার তন্মধ্যে অন্যতম। এ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে উত্তরদাতা সরাসরি গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার ব্যবহার এবং গবেষকের ধ্যানধারণা জানার সুযোগ পান (আলম, ২০০৩)। কলিন্স ডিকশনারি অব সোসিওলজির মতে সাক্ষাৎকার হচ্ছে– 'A method of collecting social data at the individual level' (Jary and Jary, 1991). আধেয় বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের উপস্থাপন বিষয়ে ইন ডেপথ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১০জন বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রতিপন্ন (Substantiate) করে কি না, মূলত তা বোঝার জন্যই বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

নমুনা সংখ্যা (Sample size)

বাংলাদেশের চারটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র এবং দুটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রকে এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় চিকিৎসক, সাংবাদিক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ১০ জন বিশেষজ্ঞকে ইন ডেপথ সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling technique)

এ গবেষণায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় এবং প্রচার সংখ্যায় শীর্ষে অবস্থানকারী দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর মধ্য থেকে চারটি বাংলা দৈনিক ও দুটি ইংরেজি দৈনিকসহ ছয়টি দৈনিক সংবাদপত্রকে গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে (Purposively) নির্বাচন করা হয়েছে। কেবল ব্রডশিটে ছাপানো সংবাদপত্রগুলোকে বর্তমান গবেষণায় নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রগুলোকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংবাদপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) আর্কাইভে প্রাপ্যতার বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এভাবে ঐতিহ্যবাহী ও দীর্ঘদিন বিরাজমান দৈনিক ইত্তেফাক এবং বহুল প্রচারিত ও পঠিত প্রথম আলোকে এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, দ্য ডেইলি স্টার ও দ্য নিউ এজ পত্রিকা চারটিকেও এ গবেষণার জন্য নমুনা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ পত্রিকাগুলোর সার্কুলার ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছেছে এবং তাদের বিশাল পাঠকগোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। দেশের সংবাদপত্র হকার্স কর্নারগুলোয় বেশির ভাগ গ্রাহককে এ পত্রিকাগুলোই বেশি সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

সংবাদপত্রের সময়, সংখ্যা ও পাতা নির্ধারণ

গবেষণার সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে নমুনাকৃত সংবাদপত্রের ২০১৭ সালের গ্রীষ্মকাল (এপ্রিল-মে-জুন) এবং শীতকালের (অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর) সব (৭৮৯) সংখ্যার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক মোট ১ হাজার ৫৯৩টি আইটেমকে এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে, সারা বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে মানুষের মধ্যে রোগের প্রকোপ বেশি মাত্রায় বিরাজমান থাকে। ফলে এ সময় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক কাভারেজ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়। নমুনাকৃত সংবাদপত্রগুলোর সব পাতা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বিশেষ ক্রোড়পত্র বা অতিরিক্ত (সাপ্লিমেন্ট) পাতাকে এ গবেষণার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

ইন ডেপথ সাক্ষাৎকারের জন্য বিশেষজ্ঞ নির্বাচন

গবেষণাটিতে ইন ডেপথ সাক্ষাৎকারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভানসড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ বিভাগের পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দুজন শিক্ষক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক, নিউ এজ পত্রিকার উপসম্পাদক, একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও দুজন সংবাদপত্র পাঠককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে (Purposively) নির্বাচিত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার আগে তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের আর্কাইভে সংরক্ষিত নমুনাকৃত সংবাদপত্রগুলোর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক সব আইটেম পাঠ করে প্রয়োজনীয় উপাত্ত তথ্য সংগ্রহের শিটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো আধেয়র

ছবিও গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে এ গবেষণায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক সর্বমোট ১ হাজার ৫৯৩টি আইটেমের (Item) আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া একটি উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে ইন ডেপথ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের উপস্থাপন সম্পর্কে ১০জন বিশেষজ্ঞের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণাটিতে নমুনাকৃত ছয়টি সংবাদপত্রের ১ হাজার ৫৯৩টি আধেয়র উপাত্ত সংগ্রহের পর তা সময়ের ক্রমানুসারে সাজিয়ে ক্রমিক নম্বর বসানো হয়েছে। কোন ধরনের ভুল বা অসংগতিপূর্ণ তথ্য আছে কি না, তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ সংখ্যায়ন বা কোডিং করা হয়েছে। তারপর উপাত্তগুলো যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সঙ্গে স্ট্যাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সায়েন্স, ভারশন ২১ ফর উইনডো (SPSS, Version 21.0 for window)-এ কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া হয়েছে। উপাত্ত ইনপুট শেষে এসপিএসএস-এর মাধ্যমে পরিমাণগত উপাত্তগুলোর গড় এবং আদর্শ বিচ্যুতি (Mean and standard deviation) হিসাব করা হয়েছে। আর গুণগত উপাত্তগুলোর শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণকৃত উপাত্তগুলো উপস্থাপনের জন্য টেবিল ও বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত বর্ণনামূলকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণাটিতে বাংলাদেশের ৬টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের ৭৮৯টি সংখ্যার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ১ হাজার ৫৯৩টি আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে গবেষণাটির ফলাফল নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র কাভারেজ

সারণি-১: সংবাদপত্রভিত্তিক স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র কভারেজ

সংবাদপত্রের নাম	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রথম আলো	২২৮	১৪.৩
ইত্তেফাক	২৪১	১৫.১
যুগান্তর	৪৩০	২৭.০
কালের কণ্ঠ	৩৩৬	২১.১
দ্য ডেইলি স্টার	২২০	১৩.৮
দ্য নিউ এজ	১৩৮	৮.৭
মোট	১৫৯৩	১০০.০

গবেষণাটির প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, যুগান্তর সবচেয়ে বেশি, ৪৩০টি (২৭.০%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশ করেছে। এরপর কালের কণ্ঠ ৩৩৬টি (২১.১%), ইত্তেফাক ২৪১টি (১৫.১%), প্রথম আলো ২২৮টি (১৪.৩%), দ্য ডেইলি স্টার ২২০টি (১৩.৮%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশ করেছে। দ্য নিউ এজ সবচেয়ে কম সংখ্যক, ১৩৮টি (৮.৭%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশ করেছে (সারণি-১)।

সারণি-২: মাসভিত্তিক স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র কাভারেজ

মাসের নাম (২০১৭ সাল)	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
এপ্রিল	৩০০	১৮.৮
মে	২৫৫	১৬.০
জুন	২২৫	১৪.১
অক্টোবর	৩০৩	১৯.০
নভেম্বর	২৭৭	১৭.০
ডিসেম্বর	২৩৩	১৪.৬
মোট	১৫৯৩	১০০.০

সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক মাসেই অনেকটা কাছাকাছি সংখ্যক স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। অক্টোবরে সবচেয়ে বেশি ৩০৩টি (১৯.০%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। এরপর এপ্রিলে ৩০০টি (১৮.৮%), নভেম্বরে ২৭৭টি (১৭.০%), মে'তে ২৫৫টি (১৬.০%), ডিসেম্বরে ২৩৩টি (১৪.৬%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। জুনে সবচেয়ে কম সংখ্যক ২২৫টি (১৪.১%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশিত হয়েছে।

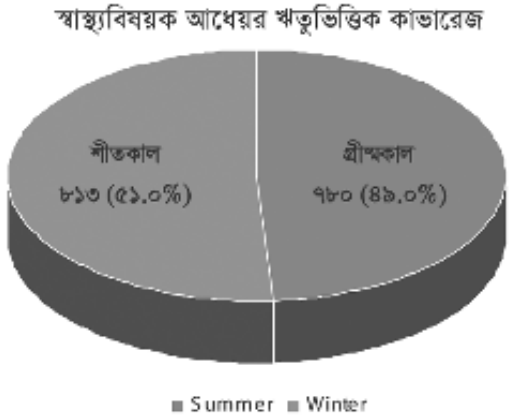

চিত্র-১: স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র ঋতুভিত্তিক কাভারেজ

সারণি-৩: সংবাদপত্র ও ঋতুভিত্তিক স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র কাভারেজ

ঋতু / সংবাদপত্রের নাম	গ্রীষ্মকাল সংখ্যা (%)	শীতকাল সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
প্রথম আলো	১২৯ (৫৬.৬)	৯৯ (৪৩.৪)	২২৮ (১০০.০)
ইত্তেফাক	৯৩ (৩৮.৬)	১৪৮ (৬১.৪)	২৪১ (১০০.০)
যুগান্তর	২২৯ (৫৩.৩)	২০১ (৪৬.৭)	৪৩০ (১০০.০)
কালের কণ্ঠ	১৮০ (৫৩.৬)	১৫৬ (৪৬.৪)	৩৩৬ (১০০.০)
দ্য ডেইলি স্টার	৯৪ (৪২.৭)	১২৬ (৫৭.৩)	২২০ (১০০.০)
দ্য নিউ এজ	৫৫ (৩৯.৯)	৮৩ (৬০.১)	১৩৮ (১০০.০)
মোট	**৭৮০ (৪৯.০)**	**৮১৩ (৫১.০)**	**১৫৯৩ (১০০.০)**

গবেষণাটির প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, শীতকালে কিছুটা বেশি (৮১৩, ৫১.০%) এবং গ্রীষ্মকালে কিছুটা কম (৭৮০, ৪৯.০%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশিত হয়েছে (চিত্র ১)। যুগান্তর গ্রীষ্মকালে ২২৯টি (৫৩.৩%) এবং শীতকালে ২০১টি (৪৬.৭%), কালের কণ্ঠ যথাক্রমে ১৮০টি (৫৩.৬%) ও ১৫৬টি (৪৬.৪%), ইত্তেফাক ৯৩টি (৩৮.৬%) ও ১৪৮টি (৬১.৪%), প্রথম আলো ১২৯টি (৫৬.৬%) ও ৯৯টি (৪৩.৪%), দ্য ডেইলি স্টার ৯৪টি (৪২.৭%) ও ১২৬টি (৫৭.৩%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশ করেছে। দ্য নিউ এজ গ্রীষ্মকালে ৫৫টি (৩৯.৯%) এবং শীতকালে ৮৩টি (৬০.১%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয় প্রকাশ করেছে (সারণি-৩)।

সারণি-৪: সংবাদপত্রের মোট জায়গা

সংবাদপত্রের মোট জায়গা (কলাম ইঞ্চি)	পত্রিকার সংখ্যা	সবচেয়ে কম	সবচেয়ে বেশি	সর্বমোট জায়গা	গড়	আদর্শ বিচ্যুতি
	৭৮৯	২৬২৪	৪৫৯২	২৫৩৮৭০৮.৪	৭০৮.৪	৩২১৭.৬

গবেষণাটির ফলাফল থেকে দেখা যায়, গড়ে পত্রিকার একটি সংখ্যার জন্য ৩২১৭.৬ কলাম ইঞ্চি (± আদর্শ বিচ্যুতি ২৭১.৭ কলাম ইঞ্চি) জায়গা বরাদ্দ ছিল। সবচেয়ে কম জায়গা ছিল ২৬২৪ কলাম ইঞ্চি এবং সবচেয়ে বেশি জায়গা ছিল ৪৫৯২ কলাম ইঞ্চি। পত্রিকার ৭৮৯টি সংখ্যায় সর্বমোট ছাপানোর জায়গা ছিল ২৫৩৮৭০৮.৪ কলাম ইঞ্চি (সারণি-৪)।

সারণি-৫: স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা

স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা (কলাম ইঞ্চি)	আধেয়র সংখ্যা	সবচেয়ে কম	সবচেয়ে বেশি	সর্বমোট জায়গা	গড়	আদর্শ বিচ্যুতি
	১৫৯৩	২.০	২৫০.৫	৩১৩৭৩.৪	১৯.৭	১৭.১

অন্যদিকে এক একটি আধেয়র জন্য গড় বরাদ্দকৃত জায়গা ছিল ১৯.৭ কলাম ইঞ্চি (± আদর্শ বিচ্যুতি ১৭.১ কলাম ইঞ্চি)। সবচেয়ে কম জায়গা ছিল ২.০ কলাম ইঞ্চি এবং সবচেয়ে বেশি জায়গা ছিল ২৫০.৫ কলাম ইঞ্চি। পত্রিকায় প্রকাশিত ১ হাজার ৫৯৩টি আধেয়র জন্য সর্বমোট বরাদ্দকৃত জায়গা ছিল ৩১৩৭৩.৪ কলাম ইঞ্চি (সারণি-৫)। অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে আনুপাতিক কাভারেজ হিসাব করলে দেখা যায়, একটি পত্রিকার মাত্র ১.২% জায়গাজুড়ে থাকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র বিষয়বস্তু

সারণি-৬: সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র বিষয়বস্তু

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র বিষয়বস্তু	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	৪৯৭	৩১.২
অসংক্রামক ব্যাধি	৩০২	১৯.০
সংক্রামক ব্যাধি	১৬৯	১০.৬
মা ও শিশুস্বাস্থ্য	১৩৮	৮.৭
রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ	১১৩	৭.১
পুষ্টি	১০৩	৬.৫
ওষুধ ও মাদকাসক্তি	৫২	৩.২
পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	৩৬	২.৩
ত্বক ও চুলের যত্ন	৩৫	২.২
মানসিক স্বাস্থ্য	২৭	১.৭
চোখের সমস্যা	১৩	০.৮
নাক, কান ও গলার সমস্যা	১৩	০.৮
দাঁতের সমস্যা	১৩	০.৮
পরিবার পরিকল্পনা	৬	০.৪
বিবিধ	৭৬	৪.৭
মোট	১৫৯৩	১০০.০

গবেষণাকর্মটিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমের মধ্যে কোন কোন বিষয়বস্তু বা ইস্যুকে কেন্দ্র করে আধেয় প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি, ৪৯৭টি (৩১.২%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। এরপর স্থান পেয়েছে অসংক্রামক ব্যাধি। দেখা গেছে, অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ে ৩০২টি (১৯.০%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে আধেয় প্রকাশিত হয়েছে ১৬৯টি (১০.৬%)। মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮টি (৮.৭%), রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ নিয়ে ১১৩টি (৭.১%), পুষ্টিবিষয়ক ১০৩টি (৬.৫%), ওষুধ ও মাদকাসক্তিবিষয়ক ৫২টি (৩.২%) এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিয়ে ৩৬টি (২.৩%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। ত্বক ও চুলের যত্ন নিয়ে ৩৫টি (২.২%), মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ২৭টি (১.৭%), চোখের সমস্যা নিয়ে ১৩টি (০.৮%) এবং নাক, কান ও গলার সমস্যা নিয়ে ১৩টি (০.৮%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। দাঁতের সমস্যা নিয়েও ১৩টি (০.৮%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক মাত্র ৬টি (০.৮%) আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়নি– এমন বিবিধ বিষয়ে আধেয় প্রকাশিত হয়েছে ৭৬টি (৪.৭%) (সারণি-৬)।

সারণি-৭: সংবাদপত্রভিত্তিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র বিষয়বস্তু

সংবাদপত্রের নাম / স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র বিষয়বস্তু	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	৬০ (২৬.৩)	৯৩ (৩৮.৬)	৯৮ (২২.৮)	১০৯ (৩২.৪)	৮২ (৩৭.৩)	৫৫ (৩৯.৯)	৪৯৭ (৩১.২)
অসংক্রামক ব্যাধি	৪২ (১৮.৪)	৫৯ (২৪.৫)	১০৪ (২৪.২)	৪৯ (১৪.৬)	৩৭ (১৬.৮)	১১ (৮.০)	৩০২ (১৯.০)
সংক্রামক ব্যাধি	২৯ (১২.৭)	১৪ (৫.৮)	৬২ (১৪.৪)	১৯ (৫.৭)	২৩ (১০.৫)	২২ (১৫.৯)	১৬৯ (১০.৬)
মা ও শিশুস্বাস্থ্য	৩৬ (১৫.৮)	১৫ (৬.২)	২১ (৪.৯)	৩০ (৮.৯)	২৬ (১১.৮)	১০ (৭.২)	১৩৮ (৮.৭)
রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ	১৫ (৬.৬)	১৩ (৫.৪)	২২ (৫.১)	৪৯ (১৪.৬)	১০ (৪.৫)	৪ (২.৯)	১১৩ (৭.১)
পুষ্টি	১০ (৪.৪)	৪ (১.৭)	৩০ (৭.০)	৩৬ (১০.৭)	৭ (৩.২)	১৬ (১১.৬)	১০৩ (৬.৫)
ওষুধ ও মাদকাসক্তি	৫ (২.২)	১৩ (৫.৪)	১৩ (৩.০)	৭ (২.১)	১০ (৪.৫)	৪ (২.৯)	৫২ (৩.২)
পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	২ (০.৯)	৬ (২.৫)	৮ (১.৯)	৪ (১.২)	৫ (২.৩)	১১ (৮.০)	৩৬ (২.৩)
ত্বক ও চুলের যত্ন	৪ (১.৮)	২ (০.৮)	২৭ (৬.৩)	১ (০.৩)	১ (০.৫)	-	৩৫ (২.২)
মানসিক স্বাস্থ্য	২ (০.৯)	৩ (১.২)	৩ (০.৭)	৩ (০.৯)	১৩ (৫.৯)	৩ (২.২)	২৭ (১.৭)
চোখের সমস্যা	৩ (১.৩)	৬ (২.৫)	১ (০.২)	৩ (০.৯)	-	-	১৩ (০.৮)
নাক, কান ও গলার সমস্যা	-	-	৯ (২.১)	৪ (১.২)	-	-	১৩ (০.৮)
দাঁতের সমস্যা	-	১ (০.৪)	১০ (২.৩)	-	২ (০.৯)	-	১৩ (০.৮)
পরিবার পরিকল্পনা	১ (০.৪)	২ (০.৮)	২ (০.৫)	-	১ (০.৫)	-	৬ (০.৪)
বিবিধ	১৯ (৮.৩)	১০ (৪.১)	২০ (৪.৭)	২২ (৬.৫)	৩ (১.৪)	২ (১.৪)	৭৬ (৪.৭)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

সারণি-৭ এ বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র পৃষ্ঠাভিত্তিক অবস্থান

সংবাদের বা কোনো প্রতিবেদনের গুরুত্ব অনুযায়ী তা কোন পৃষ্ঠায় ছাপানো হবে, তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম পাতায় এবং এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেষের পাতায় প্রকাশ করা হয়। আরও কম গুরুত্বের বিষয়গুলো ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

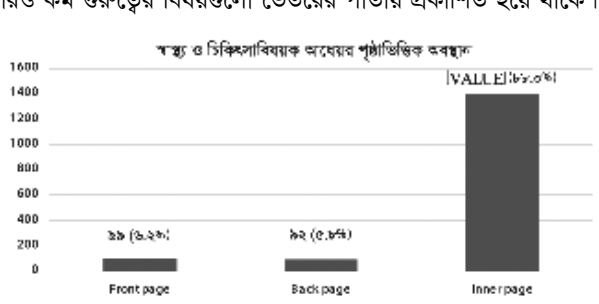

চিত্র-২: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র পৃষ্ঠাভিত্তিক অবস্থান

এ গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়গুলোর সিংহভাগ অর্থাৎ ৮৮ শতাংশ (১৪০২টি) সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ৯৯টি (৬.২%) আধেয় প্রথম পাতায় এবং ৯২টি (৫.৮%) আধেয় শেষের পাতায় প্রকাশ করা হয়েছে (চিত্র-২)।

সারণি-৮: সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র পৃষ্ঠাভিত্তিক কাভারেজ

সংবাদপত্রের নাম	প্রথম পাতা সংখ্যা (%)	শেষ পাতা সংখ্যা (%)	ভেতরের পাতা সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
প্রথম আলো	১০ (৪.৪)	৬ (২.৬)	২১২ (৯৩.০)	২২৮ (১০০.০)
ইত্তেফাক	১৪ (৫.৮)	১৯ (৭.৯)	২০৮ (৮৬.৩)	২৪১ (১০০.০)
যুগান্তর	৯ (২.১)	১৪ (৩.৩)	৪০৭ (৯৪.৬)	৪৩০ (১০০.০)
কালের কণ্ঠ	১৫ (৪.৫)	৫০ (১৪.৯)	২৭১ (৮০.৬)	৩৩৬ (১০০.০)
দ্য ডেইলি স্টার	১৫ (৬.৮)	২ (০.৯)	২০৩ (৯২.৩)	২২০ (১০০.০)
দ্য নিউ এজ	৩৬ (২৬.১)	১ (০.৮)	১০১ (৭৩.১)	১৩৮ (১০০.০)
মোট	**৯৯ (৬.২)**	**৯২ (৫.৮)**	**১৪০২ (৮৮.০)**	**১৫৯৩ (১০০.০)**

সারণি-৮ এ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সংবাদপত্রভিত্তিক ও পৃষ্ঠাভিত্তিক অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। দ্য নিউ এজ প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক মোট আধেয়র ২৬.১% (৩৬টি) প্রথম পাতায় প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে যুগান্তর প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক মোট আধেয়র মাত্র ২.১% (৯টি) প্রথম পাতায় প্রকাশ করেছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব সংবাদপত্রই তাদের সিংহভাগ (১৪০২, ৮৮.০%) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয় ভেতরের পাতায় প্রকাশ করেছে।

৫.৪ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমের ধরন

একটি আধেয় সংবাদপত্রে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন– খবর, সম্পাদকীয়, কলাম, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন কিংবা অন্য কোনো ফরম্যাটে। এ গবেষণায়ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ইসুগুলো কীভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখা হয়েছে।

আধেয়র ধরন	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
খবর	৭৮৪	৪৯.২
বক্সবিহীন আর্টিক্যাল	৪৩০	২৭.০
বক্স আর্টিক্যাল	৩০১	১৮.৯
সম্পাদকীয়	৫২	৩.৩
চিঠিপত্র	১৭	১.১
বিজ্ঞাপন	৪	০.৩
গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবেদন	৩	০.২
প্রশ্নোত্তর	২	০.১
মোট	**১৫৯৩**	**১০০.০**

সারণি-৯: সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আইটেমের ধরন

আধেয় বিশ্লেষণ শেষে স্পষ্ট হয়েছে যে, সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক আইটেমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো খবর। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র প্রায় অর্ধেকই (৭৮৪, ৪৯.২%) হচ্ছে খবর। সংবাদপত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৭৩১, ৪৫.৯%) স্বাস্থ্যবিষয়ক আর্টিক্যালও প্রকাশিত হয়েছে; যার মধ্যে ৪৩০টি (২৭.০%) ছিল বক্সবিহীন আর্টিক্যাল আর ৩০১টি (১৮.৯%) ছিল বক্স আর্টিক্যাল। গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৫২টি (৩.৩%)। এছাড়া এ সংক্রান্ত ১৭টি (১.১%) চিঠিপত্র, ৪টি (০.৩%) বিজ্ঞাপন, ৩টি (০.২%) গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবেদন এবং ২টি (০.১%) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রদানকৃত স্বাস্থ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে (সারণি-৯)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর শিরোনামের ধরন

কোনো সংবাদ বা কলামের একটি নিখুঁত শিরোনাম সেই সংবাদ-কাহিনি বা কলামের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ। শিরোনাম হচ্ছে পুরো সংবাদ-কাহিনির বিজ্ঞাপক। শিরোনাম পাঠককে কোনো সংবাদ-ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং তার সূত্র ধরিয়ে দেয় (রায়, ২০১৮)। শিরোনামের বিভিন্ন স্টাইল বা ধরন রয়েছে। এ গবেষণায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর শিরোনামের ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি-১০: শিরোনামের ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর কাভারেজ

সংবাদপত্রের নাম / শিরোনামের ধরন	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
ক্রস লাইন	১২১ (৫৩.১)	৬০ (২৪.৯)	২৩৭ (৫৫.১)	১৭৪ (৫১.৮)	৩৬ (১৬.৪)	১১ (৮.০)	৬৩৯ (৪০.১)
ফ্লাশ লেফট বা বাম স্পর্শক	২০ (৮.৮)	২২ (৯.১)	৩০ (৭.০)	২৬ (৭.৭)	১৭৫ (৭৯.৫)	১১৪ (৮২.৬)	৩৮৭ (২৪.৩)
উল্টো পিরামিড	৫০ (২১.৯)	৯৮ (৪০.৭)	১১১ (২৫.৮)	৬৪ (১৯.০)	৫ (২.৩)	১১ (৮.০)	৩৩৯ (২১.৩)
ডায়মন্ড	১৫ (৬.৬)	৯ (৩.৭)	১৬ (৩.৭)	২৯ (৮.৬)	-	-	৬৯ (৪.৩)
পিরামিড	৭ (৩.১)	৫ (২.১)	১৮ (৪.২)	২৫ (৭.৪)	৩ (১.৪)	২ (১.৪)	৬০ (৩.৮)
ওয়েস্ট লাইন বা কটিরেখ	১১ (৪.৮)	১৩ (৫.৪)	১০ (২.৩)	১১ (৩.৩)	-	-	৪৫ (২.৮)
ফ্লাশ রাইট বা ডান স্পর্শক	-	৩৪ (১৪.১)	১ (০.২)	৬ (১.৮)	১ (০.৫)	-	৪২ (২.৬)
ব্যানার বা ফলাও	১ (০.৪)	-	৭ (১.৬)	১ (০.৩)	-	-	৯ (০.৬)
ইকুয়াল লাইন বা সমরেখ	৩ (১.৩)	-	-	-	-	-	৩ (০.২)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

গবেষণার আওতাধীন সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে ক্রস লাইন শিরোনাম (৬৩৯, ৪০.১%)। প্রথম আলো, যুগান্তর ও কালের কণ্ঠ তাদের মোট স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর অর্ধেকেরও বেশিতে ক্রস লাইন শিরোনাম ব্যবহার করেছে (যথাক্রমে ৫৩.১%, ৫৫.১% ও ৫১.৮%)। ক্রস লাইন শিরোনামের পর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ফ্লাশ লেফট বা বাম স্পর্শক শিরোনাম (৩৮৭, ২৪.৩%)। দেখা গেছে, দ্য ডেইলি স্টার ১৭৫টি (৭৯.৫%) এবং দ্য নিউ এজ ১১৪টি (৮২.৬%) সর্বোচ্চ হারে ফ্লাশ লেফট বা বাম স্পর্শক শিরোনাম ব্যবহার করেছে। মোট আধেয়র ৩৩৯টিতে (২১.৩%) উল্টো পিরামিড শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এ শিরোনামটি বেশি ব্যবহার করতে দেখা গেছে ইত্তেফাক (৯৮, ৪০.৭%), যুগান্তর (১১১, ২৫.৮%) এবং প্রথম আলো (৫০, ২১.৯%) সংবাদপত্র তিনটিকে। উনসত্তরটি (৬৯, ৪.৩%) আধেয়তে ডায়মন্ড আকৃতির শিরোনাম পাওয়া গেছে। এ ধরনের শিরোনামে তিনটি লাইনের মধ্যে মাঝখানের লাইনটির দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি থাকে, যা ওয়েস্ট লাইন বা কটিরেখ শিরোনামের বিপরীত। কেবল বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতেই ডায়মন্ড শিরোনাম ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। ওয়েস্ট লাইন বা কটিরেখ শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে ৪৫টি (২.৮%) আধেয়তে, ফ্লাশ রাইট বা ডান স্পর্শক শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে ৪২টিতে (২.৬%) এবং ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৯টিতে (০.৬%)। প্রথম আলো সংবাদপত্রটিতে ৩টি (১.৩%) ইকুয়াল লাইন বা সমরেখ শিরোনাম পাওয়া গেছে, যেখানে দুই লাইনের শিরোনামের দুটি লাইন একই দৈর্ঘ্যের ছিল (সারণি-১০)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র শিরোনামে রঙের ব্যবহার

শিরোনামে রঙের ব্যবহার দেখে সংবাদ বা প্রতিবেদনটির গুরুত্ব বোঝা যায়। যে আধেয়টির শিরোনামে রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে, তা অধিকতর গুরুত্ব বহন করে এবং সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদ বা প্রতিবেদনটির প্রতি পাঠকের বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। ফলে কৌতূহলী হয়ে পাঠক এ ধরনের শিরোনামবিশিষ্ট আধেয়র ভেতরের অংশ পড়ে থাকে। যে সংবাদ একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ, সে সংবাদের শিরোনামে রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে (পান্ডে, ২০১৬)।

চিত্র-৩: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র শিরোনামে রঙের ব্যবহার

সারণি-১১: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র শিরোনামে সংবাদপত্রভিত্তিক রঙের ব্যবহার

সংবাদপত্রের নাম / শিরোনামের রং	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
আছে	১৮ (৭.৯)	৪৫ (১৮.৭)	২২ (৫.১)	৯৮ (২৯.২)	৩ (১.৪)	৪ (২.৯)	১৯০ (১১.৯)
নেই	২১০ (৯২.১)	১৯৬ (৮১.৩)	৪০৮ (৯৪.৯)	২৩৮ (৭০.৮)	২১৭ (৯৮.৬)	১৩৪ (৯৭.১)	১৪০৩ (৮৮.১)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র শিরোনামের ১৯০টিতে (১১.৯%) রঙের ব্যবহার হয়েছে। বেশির ভাগ (১৮০৩, ৮৮.১%) শিরোনামে কোনো রঙের ব্যবহার হয়নি (চিত্র-৩)। যেসব (১৯০টি) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র শিরোনামে রঙের ব্যবহার হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৮টি (২৯.২%) কালের কণ্ঠে, ৪৫টি (১৮.৭%) ইত্তেফাকে, ২২টি (৫.১%) যুগান্তরে এবং ১৮টি (৭.৯%) প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া দ্য নিউ এজে ৪টি (২.৯%) এবং দ্য ডেইলি স্টারে ৩টি (১.৩%) রঙিন শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে (সারণি-১১)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সূচনার ধরন

সংবাদ-কাহিনির উপস্থাপনমূলক বাক্যগুলোকে সূচনা বলা হয়। সাধারণত সংবাদের প্রথম প্যারা বা শুরুর অনুচ্ছেদকেই সংবাদসূচনা বলে। সূচনা অংশকে সাবধানে লিখতে হয়। একটি আকর্ষণীয় সংবাদসূচনা পাঠককে গোটা বিবরণী পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অতি সংক্ষেপে অথচ গোটা সংবাদবিবরণীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে সংবাদ কাঠামোর এ সূচনা অংশে। বেশির ভাগ সংবাদসূচনায় পাঠকের সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর থাকে (রহমান, ২০১৭)। এ গবেষণার আওতাধীন সংবাদপত্রগুলোয়ও বিভিন্ন ধরনের সংবাদসূচনা ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

সারণি ১২: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সূচনার ধরন

সংবাদপত্রের নাম / সূচনার ধরন	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
বর্ণনামূলক	১৪৩ (৬২.৭)	৭৮ (৩২.৪)	৩২২ (৭৪.৯)	২৭৮ (৮২.৭)	১৭০ (৭৭.৩)	৭৬ (৫৫.১)	১০৬৭ (৬৭.০)
সারমর্ম	৬৫ (২৮.৫)	১২১ (৫০.২)	৮১ (১৮.৮)	৪২ (১২.৫)	৪০ (১৮.২)	৫৩ (৩৮.৪)	৪০২ ২৫.২)
উদ্ধৃতিমূলক	৮ (৩.৫)	৯ (৩.৭)	১২ (২.৮)	৩ (০.৯)	৪ (১.৮)	৫ (৩.৬)	৪১ (২.৬)
কার্তুজ বা বুলেট	৫ (২.২)	১৯ (৭.৯)	৭ (১.৬)	৫ (১.৫)	১ (০.৫)	-	৩৭ (২.৩)
স্ট্যাকাটো	৫ (২.২)	৯ (৩.৭)	৩ (০.৭)	৩ (০.৯)	১ (০.৫)	২ (১.৪)	২৩ (১.৪)
প্রশ্নমূলক	-	৪ (১.৭)	৪ (০.৯)	৩ (০.৯)	১ (০.৫)	-	১২ (০.৮)
সংলাপ	২ (০.৯)	১ (০.৪)	-	২ (০.৬)	-	২ (১.৪)	৭ (০.৪)
অলংকার বা রূপকধর্মী	-	-	১ (০.২)	-	৩ (১.৪)	-	৪ (০.৩)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

মোট ১ হাজার ৫৯৩টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়তে সব সংবাদপত্রই বর্ণনামূলক সূচনা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে (১০৬৭, ৬৭.০%)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবহৃত হয়েছে সারমর্ম সূচনা (৪০২, ২৫.২%)। উদ্ধৃতিমূলক সূচনা ব্যবহৃত হয়েছে ৪১টি (২.৬%)। এছাড়া কার্তুজ সূচনা ৩৭টি (২.৩%), স্ট্যাকাটো সূচনা ২৩টি (১.৪%), প্রশ্নমূলক সূচনা ১২টি (০.৮%), সংলাপ সূচনা ৭টি (০.৪%) এবং অলংকার বা রূপকধর্মী সূচনা ব্যবহৃত হয়েছে ৪টি (০.৩%) (সারণি ১২)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর ধরন

সংবাদের ধরনের সঙ্গে এর স্পেস, পাঠকচাহিদা এবং প্রতিবেদকের দক্ষতার প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে সংবাদের বিভিন্ন স্টাইল ব্যবহৃত হয়। যেমন– সাদামাটা, অনুসন্ধানী, ব্যাখ্যামূলক, বর্ণনামূলক, ফিচার ইত্যাদি (পান্ডে, ২০১৬)। সারণি ১৩-তে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুর ধরন তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-১৩: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর ধরন

সংবাদপত্রের নাম / ইস্যু বা সংবাদের ধরন	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
বর্ণনামূলক	১৯২ (৮৪.২)	১৯২ (৭৯.৭)	৩৬৫ (৮৪.৯)	২৭৪ (৮১.৫)	১৯৯ (৯০.৫)	১৩৩ (৯৬.৪)	১৩৫৫ (৮৫.১)
অনুসন্ধানী	২৬ (১১.৪)	৩৮ (১৫.৮)	৪০ (৯.৩)	৫৫ (১৬.৪)	১৮ (৮.২)	৩ (২.২)	১৮০ (১১.৩)
সাদামাটা	৭ (৩.১)	১১ (৪.৫)	১৯ (৪.৪)	৪ (১.২)	২ (০.৯)	২ (১.৪)	৪৫ (২.৮)
প্রশ্নোত্তর	২ (০.৯)	-	১ (০.২)	১ (০.৩)	১ (০.৫)	-	৫ (০.৩)
ফিচার	-	-	৩ (০.৭)	২ (০.৬)	-	-	৫ (০.৩)
ব্যাখ্যামূলক	১ (০.৪)	-	২ (০.৫)	-	-	-	৩ (০.২)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

মোট ১ হাজার ৫৯৩টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (১৩৫৫, ৮৫.১%) ছিল বর্ণনামূলক। অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছিল ১৮০টি (১১.৩%), সাদামাটা ৪৫টি (২.৮%), প্রশ্নোত্তর ৫টি (০.৩%), ফিচার ৫টি (০.৩%) এবং ব্যাখ্যামূলক আধেয় ছিল মাত্র ৩টি (০.২%) (সারণি-১৩)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়তে ছবির ব্যবহার

যে কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদনে ছবি ব্যবহার করলে তা আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। ছবি সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। এ গবেষণাটিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোতে ছবির ব্যবহার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র-৪: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়তে ছবির ব্যবহার

সারণি-১৪: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়তে সংবাদপত্রভিত্তিক ছবির ব্যবহার

সংবাদপত্রের নাম / আধেয়তে ছবি	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
আছে	৯২ (৪০.৪)	৮৮ (৩৬.৫)	১৩৭ (৩১.৯)	১৪০ (৪১.৭)	১০৬ (৪৮.২)	১৭ (১২.৩)	৫৮০ (৩৬.৪)
নেই	১৩৬ (৫৯.৪)	১৫৩ (৬৩.৫)	২৯৩ (৬৮.১)	১৯৬ (৫৮.৩)	১১৪ (৫১.৮)	১২১ (৮৭.৭)	১০১৩ (৬৩.৬)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

মোট ১ হাজার ৫৯৩টি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র মধ্যে ৫৮০টিতে (৩৬.৪%) ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে বাকি ১ হাজার ১৩টি (৬৩.৬%) আধেয়তে কোনো ছবি ব্যবহার করা হয়নি (চিত্র-৪)। দ্য ডেইলি স্টার ২২০টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম (১০৬, ৪৮.২%) আধেয়তে ছবি ব্যবহার করেছে। কালের কণ্ঠ তার ৩৩৬টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে ১৪০টি (৪১.৭%) আধেয়তে ছবি ব্যবহার করেছে। প্রথম আলো তার ২২৮টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে ৯২টি (৪০.৪%) আধেয়তে ছবি ব্যবহার করেছে। ইত্তেফাক ২৪১টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে ৮৮টিতে (৩৬.৫%) ছবি ব্যবহার করেছে। যুগান্তর ও দ্য নিউ এজ যথাক্রমে ১৩৭টি (৩১.৯%) এবং ১৭টি (১২.৩%) আধেয়তে ছবি ব্যবহার করেছে (সারণি-১৪)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সূত্র বা উৎস বিশ্লেষণ

সূত্র ব্যতীত সংবাদ অসম্ভব। বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। একজন সাংবাদিককে তার সংবাদের সঠিক সূত্র খুঁজে বের করতে হয়। বর্তমান গবেষণায় স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়গুলোর সূত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি-১৫: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সূত্র

সংবাদপত্রের নাম / স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুর সূত্র	প্রথম আলো সংখ্যা (%)	ইত্তেফাক সংখ্যা (%)	যুগান্তর সংখ্যা (%)	কালের কণ্ঠ সংখ্যা (%)	ডেইলি স্টার সংখ্যা (%)	নিউ এজ সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
চিকিৎসক	১০৫ (৪৬.১)	৯১ (৩৭.৮)	২৫২ (৫৮.৬)	১৫১ (৪৪.৯)	৩৮ (১৭.৩)	৩ (২.২)	৬৪০ (৪০.২)
নিজস্ব প্রতিবেদক	৭৭ (৩৩.৮)	৯৫ (৩৯.৪)	১০৪ (২৪.২)	৬৯ (২০.৫)	১০৮ (৪৯.১)	৬৩ (৪৫.৭)	৫১৬ (৩২.৪)
বাই লাইন রিপোর্ট	৩৪ (১৪.৯)	৩৭ (১৫.৪)	৪৫ (১০.৫)	৫৩ (১৫.৮)	২০ (৯.১)	৩০ (২১.৭)	২১৯ (১৩.৭)
বিদেশি সংবাদ সংস্থা	৭ (৩.১)	৬ (২.৫)	-	২৯ (৮.৬)	১১ (৫.০)	৬ (৪.৩)	৫৯ (৩.৭)
এডিটর	১ (০.৪)	৯ (৩.৭)	৮ (১.৯)	৯ (২.৭)	১১ (৫.০)	১১ (৮.০)	৪৯ (৩.১)
কলামিস্ট	-	-	১৩ (৩.০)	৬ (১.৮)	১৪ (৬.৪)	১ (০.৭)	৩৪ (২.১)
দেশি সংবাদ সংস্থা	৩ (১.৩)	-	৩ (০.৭)	২ (০.৬)	৩ (১.৪)	২৩ (১৬.৭)	৩৪ (২.১)
অনলাইন সংবাদ সংস্থা	-	-	-	১৭ (৫.১)	৪ (১.৮)	১ (০.৭)	২২ (১.৪)
সাধারণ জনগণ	১ (০.৪)	৩ (১.২)	১ (০.২)	০	১১ (৫.০)	-	১৬ (১.০)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	-	৪ (০.৯)	-	-	-	৪ (০.৩)
মোট	২২৮ (১০০)	২৪১ (১০০)	৪৩০ (১০০)	৩৩৬ (১০০)	২২০ (১০০)	১৩৮ (১০০)	১৫৯৩ (১০০)

সারণি-১৫তে দেখা যাচ্ছে, গবেষণায় উল্লিখিত সময়ের ১,৫৯৩টি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আধেয়র মধ্যে ৬৪০টির (৪০.২%) সূত্র ছিল চিকিৎসক। নিজস্ব প্রতিবেদকের সংবাদ ছিল ৫১৬টি (৩২.৪%)। এতে বাই লাইন সংবাদ ছিল ২১৯টি (১৩.৭%)। বিদেশি সংবাদ সংস্থার সূত্র থেকে প্রাপ্ত আধেয় ছিল ৫৯টি (৩.৭%), এডিটর কর্তৃক লিখিত এডিটোরিয়াল ছিল ৪৯টি (৩.১%), কলাম লেখক কর্তৃক লিখিত কলাম ছিল ৩৪টি (২.১%), দেশি সংবাদ সংস্থার আধেয় ছিল ৩৪টি (২.১%) এবং অনলাইন সংবাদ সংস্থার আধেয় ছিল ২২টি (১.৪%)। সাধারণ মানুষের লেখা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র ছিল ১৬টি (১.০%)। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বার্তাসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন ছিল ৪টি (০.৩%)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ

উদ্ধৃতির ব্যবহার সংবাদকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। গবেষণাকালীন ১,৫৯৩টি স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়র মধ্যে কেবল ৪৮৯টিতে (৩০.৭%) উদ্ধৃতির উল্লেখ ছিল। বাকি ১,১০৪টি (৬৯.৩%) আধেয়তে কোনো উদ্ধৃতি ছিল না (চিত্র-৫)।

চিত্র-৫: স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আধেয়তে উদ্ধৃতির উপস্থিতি

সারণি-১৬: স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আধেয়তে উদ্ধৃতিকারীর ধরন (n = ৪৮৯)

উদ্ধৃতিকারী	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	২১২	৪৩.৪
চিকিৎসক	১৫০	৩০.৭
ভুক্তভোগী	৬২	১২.৬
রাজনীতিবিদ	৩৫	৭.২
সাধারণ জনগণ	৮	১.৬
উন্নয়নকর্মী	৭	১.৪
প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ, দার্শনিকের বাণী ও হাদিস	১৫	৩.১
মোট	**৪৮৯**	**১০০.০**

উদ্ধৃতিবিশিষ্ট ৪৮৯টি আধেয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২১২টি (৪৩.৪%) আধেয়তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য রয়েছে। ১৫০টি (৩০.৭%) আধেয়তে চিকিৎসকের মতামত সংযুক্ত ছিল। ভুক্তভোগী মানুষের উদ্ধৃতি ৬২টিতে (১২.৬%), রাজনীতিবিদের বক্তব্য ৩৫টিতে (৭.২%), সাধারণ মানুষের বক্তব্য ৮ টিতে (১.৬%) এবং উন্নয়নকর্মীর উদ্ধৃতি ছিল ৭টি (১.৪%) আধেয়তে। এছাড়া প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ, দার্শনিকের বাণী এবং হাদিসের উদ্ধৃতি ছিল ১৫টি (৩.১%) আধেয়র মধ্যে (সারণি-১৬)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ

স্বাস্থ্যবিষয়ক আধেয়গুলোর বিরাজমান সীমাবদ্ধতা (Limitatioins in the health issue) যেমন– ভুল বা জটিল শব্দের ব্যবহার, লিঙ্গবৈষম্য, নৈতিকতাবিরুদ্ধ কোনো বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি, জনস্বার্থবিরুদ্ধ কোনো বিষয়, পেশাজীবীবিরুদ্ধ কোনো বিষয় থাকলে তা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি-১৭: স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতার উপস্থিতি	সীমাবদ্ধতার ধরন	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আছে	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি	৫০	৩.১
	চিকিৎসা পেশার স্বার্থ বা সুনামবিরোধী বিষয়ের উপস্থিতি	৩২	২.০
নেই		১৫১১	৯৪.৯
মোট		১৫৯৩	১০০.০

গবেষণাধীন ১,৫৯৩টি আধেয় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ অর্থাৎ ৯৪.৯ শতাংশ (১,৫১১টি) আধেয়তে কোনো সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান নেই। মাত্র ৮২টি (৫.১%) আধেয়তে দুই ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ৫০টি (৩.১%) আধেয়তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি ছিল এবং ৩২টি (২.০%) আধেয়তে চিকিৎসা পেশার স্বার্থ বা সুনামবিরোধী বিষয়ের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছিল (সারণি-১৭)।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর গুণগত মান বিশ্লেষণ

সারণি-১৮: চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর গুণগত মান (n=১৫৯৩)

ভেরিয়েবল	পর্যবেক্ষণ	আধেয়র সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১. চিকিৎসাবিজ্ঞানের শব্দকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজীকরণ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	৬১৭	৩৮.৭
	না	১৮	১.১
	প্রযোজ্য নয়	৯৫৮	৬০.১
২. প্রদত্ত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত কি না।	হ্যাঁ	৭৯৬	৫০.০
	না	২	০.১
	প্রযোজ্য নয়	৭৯৫	৪৯.৯
৩. রোগের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	৩০৮	১৯.৩
	না	৫৫	৩.৫
	প্রযোজ্য নয়	১২৩০	৭৭.২
৪. রোগের চিকিৎসা বা চিকিৎসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	২৮৩	১৭.৮
	না	৭২	৪.৫
	প্রযোজ্য নয়	১২৩৮	৭৭.৭
৫. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা বা কুসংস্কার দূরীকরণের বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	৪৪	২.৮
	না	২৩	১.৪
	প্রযোজ্য নয়	১৫২৬	৯৫.৮
৬. রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে সাধারণ জনগণের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	২৬৬	১৬.৭
	না	১০৫	৬.৬
	প্রযোজ্য নয়	১২২২	৪৬.৭
৭. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আধেয়র ফলো-আপ ছিল কি না।	হ্যাঁ	১০৪	৬.৫
	না	২০০	১২.৬
	প্রযোজ্য নয়	১২৮৯	৮০.৯

এই গবেষণায় ২০১৭ সালের গ্রীষ্মকালের তিন মাস (এপ্রিল-মে-জুন) ও শীতকালের তিন মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর) নমুনাকৃত ছয়টি সংবাদপত্রের ৭৮৯টি সংখ্যার ১,৫৯৩টি আধেয়র চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক আধেয়র গুণগত মান যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, মোট আধেয়র মধ্যে ৬১৭টিতে (৩৮.৭%) চিকিৎসাবিজ্ঞানের শব্দকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজীকরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৮টি (১.১%) আধেয়তে তা করা হয়নি। বাকি ৯৫৮টি (৬০.১%) আধেয়তে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শব্দ তেমন একটা ব্যবহৃত হয়নি। অর্ধেক (৭৯৬, ৫০.০%) আধেয়র প্রদত্ত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত ছিল। মাত্র ২টি (০.১%) আধেয়তে প্রদত্ত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়নি। বাদবাকি ৭৯৫টি (৪৯.৯%) আধেয়তে সাধারণ তথ্য ছিল। ৩০৮টি (১৯.৩%) আর্টিক্যালে আলোচিত রোগের কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্ধশতাধিক (৫৫, ৩.৫%) আর্টিক্যালে আলোচিত রোগের কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ২৮৩টি (১৭.৮%) আধেয়তে আলোচিত রোগের চিকিৎসা বা চিকিৎসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে; কিন্তু ৭২টিতে (৪.৫%) তা করা হয়নি। আমাদের দেশে অনেক রোগ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা বা কুসংস্কার প্রচলিত আছে। চিকিৎসাবিষয়ক লেখনীর মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। এ গবেষণায় খোঁজা হয়েছে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আধেয়গুলোয় এসব ভুল ধারণা বা কুসংস্কার দূরীকরণের বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে কি না। ৪৪টি (২.৮%) আধেয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা বা কুসংস্কার দূরীকরণের বিষয়ে লেখা হয়েছে; কিন্তু ২৩টি (১.৪%) আধেয়তে তা করা হয়নি। রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই বেশি কাম্য। তাই চিকিৎসাবিষয়ক প্রবন্ধে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এ গবেষণায় দেখা গেছে, ২৬৬টি (১৬.৭%) আধেয়তে আলোচিত রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে সাধারণ জনগণের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে; কিন্তু ১০৫টিতে (৬.৬%) তা করা হয়নি। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসাবিষয়ক কোনো ঘটনার খবর সম্পর্কে মানুষের বিশেষ আগ্রহ থাকে। এজন্য তারা সংবাদপত্রে এ ধরনের খবরের ফলো-আপ প্রত্যাশা করে। এ গবেষণায় ১০৪টি (৬.৫%) স্বাস্থ্যবিষয়ক খবরের ফলো-আপ খুঁজে পাওয়া গেছে। ২০০টি (১২.৬%) আধেয়র প্রত্যাশিত ফলো-আপ সংবাদ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাদবাকি ১২৮৯টি (৮০.৯%) আধেয়র ক্ষেত্রে ফলো-আপ সংবাদ প্রযোজ্য ছিল না।

সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের উপস্থাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত

ড. শেখ আবদুস সালাম
পরিচালক, সেন্টার ফর অ্যাডভানসড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ আশাব্যঞ্জক নয়। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, সাম্প্রতিককালের অসুখ-বিসুখ কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘটনা, রোগ প্রতিরোধ ও সচেতনতাবিষয়ক মানসম্পন্ন লেখালেখির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি আইটেমে পরিণত করা সম্ভব।

অধ্যাপক সালাম বিশ্বাস করেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের এ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং চিকিৎসক-সাংবাদিক পেশাগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কমানো যেতে পারে। চিকিৎসকদের নিবন্ধে রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা যথাযথভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি কমিয়ে আনতে হবে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বার্ষিক সাফল্যকে সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল চালু করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ডা. মো. আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এবং
অধ্যাপক, নবজাতক-শিশু বিভাগ
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজকে অপ্রতুল বলে মনে করেন। সংবাদপত্রে সাংবাদিকের জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানা থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে। এতে উভয় পক্ষের কাজ করা সহজতর হবে। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। সার্বিকভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে তুলে ধরতে হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক বিটের সাংবাদিক নিয়োগ, চিকিৎসকদের লেখালেখি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পজেটিভ দিকগুলো তুলে ধরা এবং গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি আইটেমে পরিণত করা সম্ভব।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের মূল ঘটনা সংশ্লিষ্ট সবার বক্তব্যের পাশাপাশি ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা ও ঘটনা ঘটার কারণ অনুসন্ধান করে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। চিকিৎসকদের নিবন্ধ সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় হতে হবে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে তিনি বাচ্চার ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়টির উদাহরণ টেনে বলেন, 'চিকিৎসক এবং গণমাধ্যম কর্তৃক বিষয়টির ব্যাপক প্রচারের ফলে দেশের সিংহভাগ মানুষ এখন এ তথ্যটি জানে এবং মেনে চলে।' এভাবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে তাকে জনগণের এজেন্ডায় পরিণত করা সম্ভব। তিনি স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যম বিষয়ে ফান্ড তৈরি করা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডা. মো. আবদুল গণি
পরিচালক (স্বাস্থ্য)
ময়মনসিংহ বিভাগ

ডা. মো. আবদুল গণি বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজকে যথেষ্ট মনে করেন না। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদেরকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে এবং সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে তথ্য প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, মা ও শিশু, চিকিৎসকদের নিবন্ধ এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তুগুলোকে তুলে ধরার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি আইটেমে পরিণত করা সম্ভব।

ডা. গণি বলেন, স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, জনবল এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। রোগী, রোগীর লোক এবং রিপোর্টারদের সঙ্গে চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা সহকারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বেশি বেশি তৈরি করতে হবে। চিকিৎসকদের নিবন্ধে সাহিত্যরসও থাকতে হবে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। তিনি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাসিক প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. মাহবুব আলম
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম বাংলাদেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজকে যথেষ্ট মনে করেন না। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু প্রচারের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদেরকে নিয়ে এ বিষয়ে সভা করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্রের মালিক বা সম্পাদকদের নিয়ে সভা করা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকের খবর যথাযথভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মজার বিষয়গুলো সংবাদপত্রে তুলে ধরার মাধমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের একটি জনপ্রিয় ইস্যুতে পরিণত করা সম্ভব। তিনি মনে করেন, চিকিৎসকদেরও সাংবাদিকবান্ধব হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবশ্য চিকিৎসক কিংবা সাংবাদিক কারোরই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের তেমন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে তাদেরকে এ বিষয়ে যত্ন সহকারে কাজ করতে হবে। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি সংবাদপত্রে বেশি বেশি স্বাস্থ্যবিষয়ক নিবন্ধ লেখা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক বৈজ্ঞানিক কর্মশালায় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানোর বিয়য়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

এম ফরিদ আহমেদ
উপসম্পাদক, নিউ এজ

এম ফরিদ আহমেদ দেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজকে কোনোভাবেই যথেষ্ট মনে করেন না। সব সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপনী উদ্যোগ (Sponsorship) এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতিকে (Commercial Approach) বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি মনে করেন, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বেশি করে প্রবন্ধ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের একটি জনপ্রিয় আইটেমে পরিণত করা সম্ভব।

চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য রিপোর্টার উভয়েরই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তিনি। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়া তিনি চিকিৎসক-সাংবাদিক আস্থা বৃদ্ধি, চিকিৎসাক্ষেত্রে রেফারাল সিস্টেম গড়ে তোলা এবং পেশাগতভাবে লেখালেখির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শাওন্তী হায়দার
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাওন্তী হায়দার বাংলাদেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ কম থাকার পেছনে কম সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, স্বাস্থ্য বিট না থাকা এবং চিকিৎসক-সাংবাদিক দূরত্বকে দায়ী করেন। তার মতে, সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি মনে করেন, সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা বাড়ানো, পত্রিকায় স্বাস্থ্য পাতার উপস্থিতি, বিশেষ বিশেষ দিবসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাভারেজ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি আইটেমে পরিণত করা সম্ভব।

তিনি বলেন, সরকারি পর্যায় থেকে চিকিৎসক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাফল্যের খবর আরও বেশি প্রকাশ হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট তৈরি করে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা রিপোর্টিং করার বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে বলেন।

আফরোজা বুলবুল
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আফরোজা বুলবুল বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি এ কাভারেজকে অনেকটা যথেষ্টই মনে করেন। তবে সংবাদপত্রগুলোয় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের মধ্য থেকে প্রেসার গ্রুপ বা কাউন্সেলিং গ্রুপ থাকতে হবে। তিনি মনে করেন, সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য বিটের উপস্থিতি, রঙের ব্যবহার, প্রথম পৃষ্ঠায় কাভারেজ, ব্যক্তি পর্যায় থেকে সাংবদিকদের মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুকে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি উপাদানে পরিণত করা সম্ভব।

তিনি বলেন, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকদের এ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা থাকতে হবে। চিকিৎসক-সাংবাদিক সুসম্পর্ক থাকতে হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাফল্যের খবর আরও বেশি করে প্রকাশ হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রেস রিলিজ, সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যপাতা এবং চিকিৎসকদের বেশি করে লেখালেখি সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের প্রবাহ বাড়াতে সহায়তা করবে বলে তিনি মনে করেন।

ডা. মাজহারুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

ডা. মাজহারুল ইসলাম মনে করেন, দেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ যথেষ্ট নয়। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য সংবাদপত্রের নীতিমালা পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন তিনি। তিনি মনে করেন, গুরুত্ব অনুযায়ী সন্নিবেশিত করে প্রতিদিন আকর্ষণীয়ভাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি উপাদানে পরিণত করা সম্ভব।

তিনি বলেন, চিকিৎসকদের অবশ্যই সাংবাদিকবান্ধব হতে হবে। অন্যদিকে চিকিৎসকদেরও লেখালেখিতে উৎসাহিত করতে হবে। সাফল্যের সংবাদ আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়া সরকার এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাধারণ কারণে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা পরিহার করা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এ কে এম হুমায়ুন কবীর
পিএইচডি ফেলো, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

এ কে এম হুমায়ুন কবীর মনে করেন, দেশের সংবাদপত্রগুলোয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ খুবই অপ্রতুল। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট অবশ্যই থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসাবিষয়ক সভা-সেমিনারে সংবাদকর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। তিনি মনে করেন, জনগণ সচরাচর যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলা করে থাকে, সেসব বিষয়ের বেশি কাভারেজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি উপাদানে পরিণত করা সম্ভব।

তার পরামর্শ হচ্ছে, স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টারদের উচিত কোনো ঘটনার সার্বিক এবং প্রকৃতচিত্র তুলে ধরা। চিকিৎসকদেরও উচিত সাংবাদিকদেরকে সহায়তা করা। সংবাদপত্রে সাফল্যের সংবাদ প্রচার করতে হবে; কিন্তু পাশাপাশি জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য প্রয়োজনে নেগেটিভ বিষয়কেও জনগণ কিংবা কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিষয়ক সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড পত্রিকা এবং শিশু-কিশোর স্বাস্থ্য ম্যাগাজিন প্রকাশ করা যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি।

ডা. মো. তারিকুল ইসলাম খান ওয়াসিম
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও মেডিকেল অফিসার
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডা. মো. তারিকুল ইসলাম খান ওয়াসিম বাংলাদেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজকে মোটেও যথেষ্ট মনে করেন না। জনগণের স্বাস্থ্যবিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের অভাব দূর করতে আরও বেশি কাভারেজ প্রত্যাশিত। সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট অবশ্যই থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। নবীন চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষার্থী এমনকি বায়োলজির জ্ঞানসম্পন্ন যে কাউকে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করা যেতে পারে। সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসক-সাংবাদিক সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনকে সামনে রেখে প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মিডিয়া সেন্টার থাকা উচিত। কোনো ঘটনার প্রতিবাদলিপি সংবাদপত্রে সহজে দৃশ্যমান স্থানে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসক এবং জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে চিকিৎসকরা সাংবাদিকদের নিরাপদ মনে করেন।

তিনি বলেন, দেশে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানসম্পন্ন (রেজিস্টার্ড বা স্বীকৃত) সাংবাদিক তৈরি করতে হবে। সাংবাদিকদের জবাবদিহির জায়গাটি নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসাক্ষেত্রে সাফল্যের জায়গাগুলো তুলে ধরে চিকিৎসকদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইটেমকে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি ইস্যুতে পরিণত করা সম্ভব। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও

চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়কে সংবাদপণ্য হিসেবে না দেখে জনস্বার্থে সংবাদপত্রে এর কাভারেজ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

উপসংহার

যে কোনো আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্র জনগণকে সচেতন করে থাকে। সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হচ্ছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু। সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের জন্য সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল। সংবাদপত্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুগুলো সাধারণ জনগণ এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। গবেষক, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকসহ সবাই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক খবর ও তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে থাকেন। চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের বেশি বেশি উপস্থাপন প্রত্যাশা করেন। কারণ এতে অসুখবিসুখ, চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ফলাফল বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং বাস্তবসম্মত ধারণার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুল ধারণা বা কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এছাড়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসকদের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্যও তারা সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত কাভারেজ প্রত্যাশা করে থাকেন। এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, সংবাদপত্রগুলোয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুর কাভারেজ মাত্র ১.২%, যাকে বিশেষজ্ঞরা অপ্রতুল বলে মনে করেছেন। সংবাদপত্রের পাতায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর কাভারেজ উল্লেখযোগ্য হারে কম থাকার বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে, এ বিষয়ে সংবাদপত্রের মনোযোগ নেই এবং এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ কারণেই বেশির ভাগ সংবাদপত্রে কোনো স্বাস্থ্য বিট নেই। সংবাদপত্রগুলো ঘটনানির্ভর ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সংবাদই বেশি কাভার করে, যা পত্রিকার কাটতি বাড়ায় বলে তারা মনে করে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলোর সিংহভাগ অর্থাৎ ৮৮ শতাংশ সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পাতায় স্থান পেয়েছে ৬ শতাংশের সামান্য উপরে। এটা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়কে প্রাধান্য দেয় না। সংবাদপত্রগুলো স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তেমন একটা করে না। সংবাদপত্রগুলোয় স্বাস্থ্যবিষয়ক ইস্যুর ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের যথাযথ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি। কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয় ছাড়া সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য বিষয়কে সংবাদপত্রগুলো এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এ গবেষণায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যুগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোর দীনতা প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা তার নিজের ও পরিবারের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান বা চিকিৎসা বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠার জন্য সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের যথেষ্ট প্রবাহ থাকা প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ গবেষণায় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের কাভারেজের বিদ্যমান সবল ও দুর্বল দিকের পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও উঠে এসেছে।

সুপারিশমালা

১. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বিশ্লেষণ করে নিম্নরূপ সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে:

২. যেহেতু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং মানুষের মনে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ধারণা সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে গণমাধ্যম কাভারেজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; সুতরাং সংবাদপত্রে এ বিষয়ে কাভারেজ বর্তমানের (১.২%) চেয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়কে সংবাদপণ্য হিসেবে না দেখে জনস্বার্থে সংবাদপত্রে এর কাভারেজ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৩. গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক বিট আবশ্যিক করতে হবে।

৪. জীবন ও জীবিকার জন্য সুস্বাস্থ্য অপরিহার্য। জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আরও বেশি গুরুত্বসহকারে এবং আকর্ষণীয়ভাবে সংবাদপত্রে উপস্থাপন করতে হবে।

৫. তথ্যের ঘাটতি পূরণ করে স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদে প্রকৃত তথ্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। চিকিৎসা পেশার স্বার্থ বা সুনামবিরোধী বিষয়গুলোকে পরিহার করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবাদের ফলো-আপ থাকতে হবে।

৬. চিকিৎসককে আরও বেশি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক মানসম্পন্ন নিবন্ধ জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং নিবন্ধে রোগের লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা বা চিকিৎসার প্রাপ্যতা এবং রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. সংবাদকর্মীদের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিক নিয়োগ, চিকিৎসকদের লেখালেখি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা এবং গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুগুলোকে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় একটি আইটেমে পরিণত করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যবিষয়ক সংবাদপত্র বা স্বাস্থ্য ম্যাগাজিন চালু করা যেতে পারে।

৯. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিকিৎসক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে।

১০. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সরকার, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, প্রতিবেদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

১১. বাংলাদেশের সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যের উপস্থাপন বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা করা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

* আলম, ড. খুরশিদ (২০০৩)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (পঞ্চম সংস্করণ); ঢাকা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স।
* চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৬)। *গণজ্ঞাপন* (দ্বিতীয় সংস্করণ); কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
* পান্ডে, ড. প্রদীপ কুমার (২০১৬)। *সংবাদপত্রের প্রথম ও শেষ পাতায় মফস্বল সংবাদ: একটি সমীক্ষা*; ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ।
* মুখোপাধ্যায়, পবিত্র কুমার (১৯৯৪)। *দৈনিক ও সাময়িকপত্র, সংবাদ সংগঠন ও পরিচালনা*; কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
* রহমান, ড. অলিউর (২০১৭)। *সাংবাদিকতা: ধারণা ও কৌশল* (দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ); ঢাকা: পলল প্রকাশনী।
* রায়, ড. সুধাংশু শেখর (২০১৮)। *সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র;* ঢাকা: পলল প্রকাশনী।
* সিকদার, সৌরভ (২০১৭)। সংবাদপত্রে প্রমিত বাংলার প্রয়োগ: বর্তমান অবস্থা জরিপ; ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ।
* Bauer, M W and Bucchi, M (2007). *Investigating Science Communication in the Information Age: Implications for Public Engagement and Popular Media;* Routledge.
* Brown, J D and Walsh-Childers, K (1994). *Effect of media on personal and public health*. In: J Bryant, D Zillmann (Eds.): *Media Effects: Advance in theory and research*; Hillsolate, New York: Erlbaum.
* Bryant, J and Thompson S (2002). *Fundamentals of media effects*; New York: McGraw-Hill.
* Cohen, Bernard C (1963). *The press and foreign policy*; Princeton: Princeton University Press.
* Dearing, J W and Rogers, E (1996). *Agenda setting;* SAGE Publications.
* Freimuth, Viski S., Greenberg, Rachel H., DeWitt,Jean., Romano, Rose Marry (1984). *Covering Cancer: Newspapers and the public interest*. J Communication; 34.
* Goldarce, B (2008). *Bad Science: Quacks, Hacks and Big Pharma Flacks* (Fourth Estate).
* Gupta, A and Sinha, A K (2008). *Health coverage in mass media: a content analysis*. J. Communication; 1 (1).
* http://www.jli.edu.in/course/professional-diploma-in-medical-journalism, accessed on 12.12.2017.

* https://en.m.wikipid.org>wiki>medical journalism, accessed on 17.12.2017.
* Islam, S M Shafiul and Marjan, S M Haque (2013). *Trends of TV news coverage in Bangladesh.* Daffodil International University Journal of Humanities and Social Science; 1.
* Jary, D and Jary, J (1991). *Collins Dictionary of Sociology* (Illustrated Ed.); New York: Harper Collins.
* Johnson-Cartee, K S (2004). *News Narratives and News Framing: Constructing Political Reality*; Rowman and Littlefield.
* Kaiser Family Foundation and Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism (2008). *Health news coverage in the US media*: January 2007- June 2008.
* Kerlinger, F (1973). *Foundations of behavioural research* (2nd Ed.); New York: Holt, Rinehart and Winston.
* Kiernan, V (2006). *Embargoed Science;* University of Illinois Press.
* Lai, O and Dele, Odunlami (2008). *Breadth or depth: a content analysis of health pages in the Nigerian press.* Sexual Health Matters; 9 (1).
* Lasswell, Harold D (1948). *The structure and function of communication in society* In: Bryson L, (ed.). *The Communication of ideas*; New York: Institute for Religious and Social Studies.
* Leask, J., Hooker, C. and King, C (2010). *Media coverage of health issues and how to work more effectively with journalist: a qualitative study.* BMC Public Health; 10.
* Lippmann, W (1922). *Public Opinion*; New York: Harcourt, Brace & Co.
* McCombs, M E and Shaw, D (1972). *The agenda setting function of mass media;* Public Opinion Quarterly; 36 (2).
* McCombs, M E (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion* (Polity).
* McCombs, M E and Shaw, D (2006). *A First book at Communication Theory by Em Griffin;* New York: McGraw Hill International; 28.
* Mc Quail, D (2010). *Mc Quail's mass communication theory* (6th ed.); London: SAGE Publications.
* Nelkin, D (1995). *Selling Science: How the Press Covers Science and Technology;* W H Freeman and Co.
* Pan, Z and Kosicki, G M (1993). *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*. Political Communication; 10 (1).
* Parsons, T (1954). *Essays in Sociological theory*, Glencoe, III: The Free Press.
* Reese, S D., Gandy, O H and Grant, A E (eds 2003). *Framing Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the social world;* Lawrence Erlbaum.
* Robert, G P and Yeo, M (2011). *Medical and health news and information in UK media: The current state of knowledge*, Reuters Institute for the study of journalism; University of Oxford, Report.
* Science Media Centre (2002). MMR: *Learning Lessons*: www.sciencemediacentre.org/pages/publications/index.php?&showArticle=2. Accessed on 24.04.2014.
* Shih, T J., Wijay, R and Brossard, D (2008). *Media coverage of public health epidemics: Linking framing and issue attention cycle toward an integrated theory of print news coverage of epidemics.* Mass communication and Society; 11. DOI: 10.1080/15222205430701668121.
* Wallack, L., Dorfman, L., Jernigan, D and Themba-Nixon, M (1993). *Media Academy and Public Health: Power for Prevention*; Newbury P-ark, CA: SAGE.
* Weber, R P (1990). *Basic Content Analysis*. 2nd Edition. Bevery Hills; CA: SAGE Publications.
* Wimmer, R and Dominik, J R (1987). *Mass Media Research: An Introduction*; New York Press.

'বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের কাভারেজ' শিরোনামের এই গবেষণাকর্মটি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের 'অতিথি গবেষণা কর্মসূচি'র আওতায় পরিচালিত হয়। গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেন অতিথি গবেষণা কর্মসূচির গবেষক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ডা. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান খান। গবেষণাকর্ম পরিচালনায় দিকনির্দেশনা প্রদান ও গবেষণা-প্রতিবেদন মূল্যায়ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুধাংশু শেখর রায়। তত্ত্বাবধান করেছেন পিআইবির গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক আকতার হোসেন। গবেষণাকর্মের সমন্বয়ক ছিলেন অতিথি গবেষণা কর্মসূচির সমন্বয়কারী পিআইবির গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হক।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মূল গবেষণাকর্মের আংশিক নিরীক্ষায় প্রকাশ করা হলো

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম সংবাদ

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বিএফইউজের শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) পক্ষ থেকে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ১৫ আগস্ট সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালালের নেতৃত্বে সাংবাদিক নেতারা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তাঁরা ফাতেহা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাত করেন।

এ সময় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, সাবেক সভাপতি শফিকুর রহমান এমপি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুল মজিদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক জিহাদুর রহমান জিহাদসহ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ১৬ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, চিত্রপ্রদর্শনী, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে জাতীয় প্রেস ক্লাব। এছাড়া বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলসহ কয়েকটি সাংবাদিক সংগঠন প্রেস ক্লাব চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সকালে প্রথমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর ১৫ আগস্টের সব শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদের আগে বক্তৃতায় সাংবাদিক নেতারা সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পেছনে ষড়যন্ত্রে জড়িতদের বিচার দাবি করেন। তাঁরা বলেন, এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

পরে প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। সাদাকালো ফ্রেমের ছবিগুলোয় জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

সূত্র: ১৬ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

লন্ডনে ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

লন্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সাংবাদিকরা মানুষের মনন ও উন্নত জাতি গঠন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্য কোনো পেশার মানুষ চাইলেও এভাবে করতে পারেন না। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উন্নত দেশে দেখা যায়, অবকাঠামো থাকলেও জাতি গঠনে তারা সেভাবে মনোযোগী না হওয়ায় মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আমি মনে করি, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মেধা, মনন, দেশাত্মবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নত জাতি গঠন করতে হবে। মন্ত্রী মাদক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আসক্তি থেকে মুক্ত করে তরুণ সমাজকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

৩ জুলাই লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট কাভার করতে আসা ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লন্ডনে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র: ৫ জুলাই ২০১৯, ইত্তেফাক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সম্পাদকদের মতবিনিময় সভা

ঢাকা উত্তরের মেয়রকে সম্পাদকদের পরামর্শ

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনকে ডেঙ্গু আক্রান্ত নগরবাসীর পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকরা। তাঁরা মনে করেন, কর্তৃপক্ষকে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুই মেয়রকেই প্রমাণ করতে হবে তাঁরা জনগণের পাশে আছেন। পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকেও দায়িত্বশীলদের বিরত থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষকে পাশে পেলে নগরবাসীও ডেঙ্গু মোকাবিলায় উদ্যোগী হবে। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

২৯ জুলাই রাজধানীর গুলশান ক্লাবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে 'ডেঙ্গু মোকাবিলা ও পরিচ্ছন্ন নগরী বিনির্মাণে সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা'র আয়োজন করা হয়। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম সম্পাদকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় সম্পাদকদের পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়। এসব পরামর্শের মধ্যে ছিল বিনামূল্যে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সেখানে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নেওয়া, ডেঙ্গু বিষয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যদান থেকে বিরত থাকা, ডেঙ্গু নিয়ে একটি পৃথক গবেষণা সেল গঠন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সিটি করপোরেশনের সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান জোরদার করা। মেয়র এসব পরামর্শ গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি মশক নিধনে ব্যর্থতার জন্য দুঃখও প্রকাশ করেন।

সভায় বক্তব্য দেন প্রবীণ সাংবাদিক রাহাত খান, ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, ডেইলি সান সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী, বাংলানিউজের সম্পাদক জুয়েল মাজহার, বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, এবি নিউজের সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায়, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান বার্তা সম্পাদক আনিসুর রহমান, আমাদের নতুন সময়ের সম্পাদক মাসুদা ভাট্টি প্রমুখ।

সূত্র: ৩০ জুলাই ২০১৯, সমকাল

গোলাম সারওয়ার আজীবন লড়াকু ছিলেন: নাসিম

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ নাসিম এমপি বলেছেন, সমকালের সম্পাদক গোলাম সারওয়ার যত বড়ো মানের সাংবাদিক ছিলেন, তার চেয়েও বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। রাজনীতিকদের প্রশংসা করতেন, আবার কড়া সমালোচকও ছিলেন। ৩০ আগস্ট সমকালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে নাগরিক স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর সমকাল কার্যালয়ের মিলনায়তনে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতেই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে প্রয়াত সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম জানান, গোলাম সারওয়ারের মতো একজন ছাত্র পেয়ে তিনি শিক্ষক হিসেবে গর্বিত।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, গোলাম সারওয়ার উঁচু মাপের একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর দেখানো পথে দেশের সাংবাদিকতা আগামী দিনে প্রতিটি ক্রান্তিকাল পেরিয়ে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, জাগরণ সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবেদ খান, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, সমকাল প্রকাশক ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, কবি কামাল চৌধুরী, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, ডিআরইউ সভাপতি ইলিয়াস হোসেন প্রমুখ।

সূত্র: ৩১ আগস্ট ২০১৯, ইত্তেফাক

সাংবাদিকদের বিভক্তি সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতায় বড়ো বাধা: আবু সাঈদ খান

'ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে তো বটেই, এমনকি স্বৈরাচার এরশাদ আমলেও ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছে সাংবাদিক সমাজ। কিন্তু বর্তমানে সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা সাংবাদিকদের মধ্যে বিভক্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ। অনেক সাংবাদিক ব্যক্তিস্বার্থের কাছে নীতি ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছেন। ফলে সাংবাদিকতায় মূল্যবোধ ও পেশাদারিত্বের অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। তাই এখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। তা করতে হলে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।'

'সংবাদমাধ্যম, রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক একক বক্তৃতায় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আবু সাঈদ খান

এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির অষ্টাদশ মাসিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

২৬ আগস্ট এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে বক্তৃতায় ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার চিত্র তুলে ধরে সমকালের উপসম্পাদক আবু সাঈদ খান বলেন, 'সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কালাকানুন প্রণীত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করেছিল। তবে স্বাধীনতার পর সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়নি।'

তিনি বলেন, 'নব্বইয়ের দশক বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের যৌবনকাল। বৃহৎ পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রবেশের ফলে এ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এতে সংবাদপত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি হয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মেজবাহ উস সালেহীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ।

সূত্র: ২৭ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

সাংবাদিক কামাল লোহানী পেলেন আলতাফ মাহমুদ পদক

সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের দুই স্থপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও জামী-আল-সাফী পেলেন আলতাফ মাহমুদ পদক। ৩০ আগস্ট শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে শহিদ আলতাফ মাহমুদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ পদক দেওয়া হয়।

পদকপ্রাপ্ত তিন গুণীকে সম্মাননা স্মারক ছাড়াও পরিয়ে দেওয়া হয় উত্তরীয়। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ পদকপ্রাপ্তদের হাতে তুলে দেন ১০ হাজার টাকার শুভেচ্ছা উপহার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাতা সংস্কৃতিজন নাসিরউদ্দীন ইউসুফ।

সূত্র: ৩১ আগস্ট ২০১৯, কালের কণ্ঠ

নারী স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে পুরস্কার পেলেন ১০ সাংবাদিক

মেয়েদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে শ্রেষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের জন্য 'জার্নালিস্ট ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১০ সাংবাদিক।

শ্রেষ্ঠ রিপোর্টের জন্য ২৮ জুলাই রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ১০ সাংবাদিকের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থমূল্য তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যসহ অতিথিরা

পাঁচ ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন জাহিদুর রহমান (সমকাল), মুসলিমা জাহান সেতু (প্রথম আলো), নাওয়াজ ফারহিন (ঢাকা ট্রিবিউন), মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানি (নিউ নেশন), মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন আল ইমরান (বাংলা ট্রিবিউন), মাসুদুল হক (ইউএনবি), আজিজুর রাহমান (যমুনা টিভি), এস এম আতিকুর রাহমান (এনটিভি), সাদিয়া ন্যানসি (রেডিও টুডে) ও এমডি নাহিয়ান নাসের (রেডিও নেক্সট)। এ সময় ফেলোশিপে অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের মাঝেও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

সূত্র: ২৯ জুলাই ২০১৯, সমকাল

ছয় সাংবাদিক পেলেন সিটিটিসি পুরস্কার

সহিংস উগ্রবাদ বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) পুরস্কার পেলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের ছয় সাংবাদিক। ৩০ জুন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে সিটিটিসির প্রধান মনিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক হলেন যৌথভাবে দ্য ডেইলি স্টারের শরিফুল ইসলাম ও জামিল খান, প্রথম আলোর শেখ সাবিহা আলম, সময় টেলিভিশনের খান মোহাম্মদ রুমেল, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের শামীমা সুলতানা এবং বাংলা ট্রিবিউনের নুরুজ্জামান লাবু। পুরস্কার হিসেবে সাংবাদিকদের ৫০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়।

সহিংস উগ্রবাদ বিষয়ে সেরা রিপোর্টিংয়ের বিচারক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, ডিবিসি নিউজের সিইও মনজুরুল ইসলাম ও ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদুর রহমান।

সূত্র: ২ জুলাই ২০১৯, প্রথম আলো

সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ঢাবির ১০ শিক্ষার্থী

২০১৮ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১০ শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' দেওয়া হয়। ২৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কারের সনদপত্র ও চেক তুলে দেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক কাবেরী গায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা' করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী অধ্যাপক সিতারা পারভীন ছিলেন সৎ, আদর্শবান ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্বামী ও বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী এবং বৃত্তিপ্রাপ্তদের পক্ষে মেহজাবিন বশির তুলি।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন মেহজাবিন বশির তুলি, শারমিন জাহান জোহা, ফায়েজ আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক সোহেল, তন্ময় সাহা জয়, নম্রতা তালুকদার অর্পা, তাহমিনা আক্তার জেনি, সুমাইয়া তানিম, শামিমা নাসরিন ও মেহেরুন নাহার মেঘলা।

সূত্র: ২৭ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড পেলেন দুই সাংবাদিক

২০১৯ সালের র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন ভারত ও মিয়ানমারের দুই সাংবাদিকসহ পাঁচজন। পুরস্কার বিজয়ী হলেন ভারতের

সাংবাদিক রবিশ কুমার, মিয়ানমারের সাংবাদিক কো সোয়ে উইন, থাইল্যান্ডের মানবাধিকার আইনজীবী আংখানা নিলাপাইজিত, ফিলিপাইনের রয়মুন্ডো পুজান্তে ও দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জং কি। ৯ সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ফিলিপাইনের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট র‍্যামন ম্যাগসেসের নাম অনুসারে ১৯৫৮ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তিত হয়।

এশিয়ার নোবেল হিসেবে খ্যাত এ পুরস্কার সাংবাদিকতা, জনসেবা, সামাজিক নেতৃত্ব, শান্তি, সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও কৃতিত্বের জন্য এশিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

সূত্র: ৪ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের এক দশক পূর্তি

সাহিত্য ছাড়া সাংবাদিকতা ভাবা যায় না। সাংবাদিকতা করতে হলে সাহিত্যের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সাহিত্য সৃজনশীল আর সৃজনশীল সাংবাদিকতা সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়। আগে যাঁরা সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরাই সাংবাদিকতা করতেন।

৪ আগস্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় আলোচকরা এসব কথা বলেন।

আলোচকরা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। বই না পড়লে মনের মুক্তি হবে না। শুধু পড়ার জন্য বই পড়া না, বই পড়তে হয় মনের বিকাশের জন্য।

সূত্র: ৫ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

চীনে সাংবাদিক বহিষ্কার

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আত্মীয়দের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সাংবাদিককে বহিষ্কার করেছে বেইজিং। বহিষ্কার হওয়া ওই সাংবাদিকের নাম চেন হান ওয়াং। সিঙ্গাপুরের নাগরিক ওয়াং ২০১৪ সাল থেকে বেইজিংয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ব্যুরোপ্রধান ছিলেন। তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিদেশি সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পরিচয়পত্র আর নবায়ন করেনি চীনা কর্তৃপক্ষ। ৩০ আগস্ট এক বিবৃতিতে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, চীনের প্রতি কিছু বিদেশি সাংবাদিকের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে তাঁরা। এ ধরনের সাংবাদিকদের চীনে স্বাগত জানানো হবে না। তবে যারা চীনের আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, তাঁদের সাহায্য করা হবে।

সূত্র: ৩১ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো

নিউজ টোয়েন্টিফোরের বর্ষপূর্তি

চতুর্থ বর্ষে নিউজ টোয়েন্টিফোর

দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা

দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে ২৮ জুলাই সংবাদভিত্তিক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোরের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণের অনুষ্ঠানটি হয় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) নবরাত্রি মিলনায়তনে। রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে আনন্দঘন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই টেলিভিশন চ্যানেলকে জানায় ফুলেল শুভেচ্ছা।

সূত্র: ২৯ জুলাই ২০১৯, কালের কণ্ঠ

নিখোঁজ সাংবাদিক উদ্ধার সুনামগঞ্জে

ঢাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া মোহনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি মুশফিকুর রহমানকে সুনামগঞ্জে পাওয়া গেছে। ৬ আগস্ট সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গোবিন্দপুর থেকে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংবাদিক মুশফিকুর মনে করছেন, কুমিল্লার দাউদকান্দির একটি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিপক্ষ পরিকল্পিতভাবে তাঁকে মেরে ফেলার জন্য এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।

সূত্র: ৭ আগস্ট ২০১৯, সমকাল

শোক সংবাদ

এসএম সেলিম আহমেদ

রাজশাহীর বাঘার স্থানীয় সাংবাদিক এসএম সেলিম আহমেদ ভাঙারিয়া ৩০ জানুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

খলিলুর রহমান বাবর

ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও প্রযোজক খলিলুর রহমান বাবর (৬৭) আর নেই। ২৬ আগস্ট রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। বিএফডিসিতে জানাজা শেষে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

বাবর ১৯৫২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। খলনায়ক হলেও চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র আমজাদ হোসেন নির্মিত 'বাংলার মুখ'।

নায়করাজ রাজ্জাক প্রযোজিত ও জহিরুল হক পরিচালিত 'রংবাজ' চলচ্চিত্রে বাবর প্রথম খলচরিত্রে অভিনয় করেন। এরপরই তাঁর ক্যারিয়ার পায় ভিন্নমাত্রা। এ অভিনেতা পরিচালনা করেছেন দয়াবান, দাগী, দাদাভাইসহ বেশকিছু ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র। পাশাপাশি বেশকিছু চলচ্চিত্র প্রযোজনাও করেছেন তিনি।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (৬৮) আর নেই। ১০ জুলাই রাজধানীর গেণ্ডারিয়ার আসগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি রাজনীতি ও অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে নিয়মিত কলাম লিখতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং সাংবাদিকতায় পুনরায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। ১৯৭০ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরে দৈনিক বাংলা)-এ যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সাংবাদিকতা পেশায় আসেন। ১৯৮০ সালে সক্রিয় সাংবাদিকতা ছেড়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে সাংবাদিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৯৫ সালে তিনি গড়ে তোলেন বেসরকারি মিডিয়া সংস্থা সেন্টার অব ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন। আমৃত্যু তিনি এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

হাসান আরেফিন

বিশিষ্ট সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান আরেফিন (৫৯) আর নেই। ৮ জুলাই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে ভুগছিলেন।

হাসান আরেফিন প্রায় ৩০ বছর সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি প্রকাশিতব্য 'দৈনিক নতুন কাগজ'-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া দৈনিক বর্তমানের উপসম্পাদক, যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি ডিআরইউর সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইমতিয়ার ফৌরদৌস সুইট

কালের কণ্ঠের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মো. ইমতিয়ার ফেরদৌস সুইট (৩৯) আর নেই। ১৫ আগস্ট সদর পৌরসভার নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। কালের কণ্ঠের পাশাপাশি দৈনিক করতোয়া ও গাজী টিভির জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

সৈয়দ আখতারুজ্জামান সিদ্দিকী লাবলু

ভোরের কাগজের প্রধান প্রতিবেদক সৈয়দ আখতারুজ্জামান সিদ্দিকী লাবলু আর নেই। ৮ জুলাই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি লিভার ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

লাবলু অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদকদের সংগঠন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সাবেক সভাপতি। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা এই সদস্য পাঁচবার ক্র্যাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) স্থায়ী সদস্য ছিলেন।

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

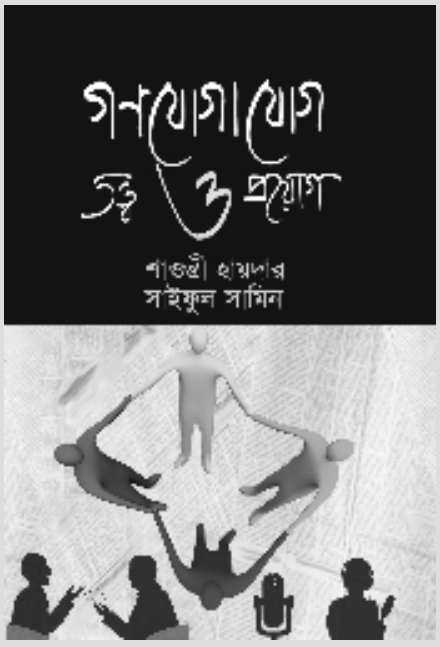

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শোক দিবস উপলক্ষ্যে পিআইবিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দোয়া ও আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১৫ আগস্ট পিআইবিতে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব কবি কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) নুরুল করিম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জাকির হোসেন, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহীন ইসলাম এনডিসি, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন। পিআইবির সাবেক মহাপরিচালক তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মীর মো. নজরুল ইসলাম, তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকারসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

কবি কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির মহানায়ক। বাঙালিদের কোনো দেশ ছিল না, কোনো ভূখণ্ড ছিল না। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের দেশ দিয়েছেন, ভূখণ্ড দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু আজও বাঙালি জাতির জন্য প্রাসঙ্গিক। কারণ বঙ্গবন্ধু একটি প্রেরণার নাম, বঙ্গবন্ধু একটি সাহসের নাম। বঙ্গবন্ধুকে তাই নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে যথাযথ মূল্যায়ন করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পিআইবি প্রতিবেদক

রংপুরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং এটুআই'র যৌথ উদ্যোগে ২২ জুলাই রংপুর সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে রংপুর বিভাগের নারী সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম এবং সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। রংপুর বিভাগের ৮টি জেলায় কর্মরত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ৩০ জন নারী সংবাদকর্মী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় সাংবাদিকতায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও এটুআই উদ্যোগ, তথ্য অধিকার আইন ও সাংবাদিকতার নীতিমালা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে করণীয় ও বর্জনীয় শীর্ষক বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করা হয়।

এটিইউ কর্মকর্তাদের জন্য মিডিয়া ম্যানেজমেন্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের (এটিইউ) যৌথ উদ্যোগে এটিইউ কর্মকর্তাদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৩-২৫ জুলাই) মিডিয়া ম্যানেজমেন্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ পিআইবিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ জুলাই প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আবুল কাশেম, বিপিএম-সেবা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মো. দিদার আহাম্মদ, বিপিএম, পিপিএম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনো স্বচ্ছ নয়– এই উপলব্ধি থেকে গণমাধ্যমগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে পিআইবি ও এটুআই প্রোগ্রামের করণীয় নির্ধারণে ৩১ জুলাই পিআইবি সেমিনার কক্ষে 'পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার' বিজয়ীদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। এটুআই প্রোগ্রামের কমিউনিকেশন এক্সপার্ট তানজিনা শারমিন গণমাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক কাভারেজ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান এমপি

পাবনায় সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) উদ্যোগে পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য দুই পর্বে তিনদিন করে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাবনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত প্রথম পর্বের (৭-৯ সেপ্টেম্বর) সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পাবনা জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

দ্বিতীয় পর্বের সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১০-১২ সেপ্টেম্বর। পাবনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পাবনা জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আতিয়ুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শিবজিত নাগ। সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

উভয় প্রশিক্ষণে পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৩৫ জন করে ৭০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চাঁদপুরে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত চাঁদপুর জেলার ৮টি উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ চাঁদপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ আগস্ট প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মুহম্মদ শফিকুর রহমান এমপি। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। চাঁদপুরের ৮টি উপজেলার ৩৫ জন সাংবাদিক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ফ্যাশন ও লাইফস্টাইলবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম ফ্যাশন ও লাইফস্টাইলবিষয়ক সাংবাদিকতায় তিন দিনব্যাপী (৫-৭ জুলাই) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জুলাই পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী চঞ্চল মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৪০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

পাবনায় শিশু ও নারীবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) উদ্যোগে শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক দুই দিনের রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্প্রতি পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) সভাপতি ও পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক

চাঁদপুরে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ৩০ আগস্ট চাঁদপুর প্রেস ক্লাব সম্মেলন কক্ষে শেষ হয়েছে। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মো. মাজেদুর রহমান। সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শহীদ পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র সূত্রধর ও পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক মনিরুল ইসলাম কবির। প্রশিক্ষণে চাঁদপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ সংবাদকর্মী অংশ নেন।

পিআইবি'তে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

এমআরডিআইয়ের সহযোগিতায় পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মহিলাদের ফিস্টুলা বিষয়ে অভিজ্ঞতাবিনিময় সভা

পাবনা সার্কিট হাউসে টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবি ও অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ মহিউদ্দিন। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে পাবনা জেলার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবির প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ১৫ জুলাই পিআইবি সেমিনার কক্ষে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও ফোজো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের প্রজেক্টলিডার সুফিয়া হাল্টকুইস্ট। এমআরডিআই'র প্রোগ্রাম ও কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান মিরাজ আহমেদ চৌধুরীও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবিতে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া এবং মুকসুদপুর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৮-১০ সেপ্টেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সমাপ্ত হয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব শাবান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) উপপ্রধান (প্রতিবেদক) সৈয়দ শুকুর আলী শুভ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পাবনায় টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত পাবনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৭-৯ সেপ্টেম্বর) টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাবনা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পাবনার পুলিশ সুপার শেখ রফিকুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম বক্তব্য দেন। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে পাবনার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।